দাজ্জালঃ কালো পতাকার চূড়ান্ত শত্রু

"হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর জন্ম হতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের বিপর্যয় ও ফিতনার চেয়ে বিরাট ফিতনা আর কোন কিছুই হবে না।" (মুসলিম)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

" হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই এবং আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যখানের ফিতনা থেকে এবং আশ্রয় চাই মাসিহিদ দাজ্জাল থেকে। "

{বুখারি – ৮৩২,১৩৭৭; মুসলিম – ৫৮৮,৫৯০; আবু দাউদ – ৮৮০,৯৮৩,৯৮৪,১৫৪২; তিরমিযি – ৩৬০৪, নাসাঈ – ১৩০৯,২০৬০,২০৬৩,৫৫০৬ (এবং আরও অনেক); ইবনে মাজাহ – ৯০৯,৩৮৪০}

আরেক বর্ণনায় পাপ ও সন্দেহ থেকে আশ্রয় চাওয়াও উল্লেখ আছে।

সূচিপত্র

দাজ্জালের আলোচনাঃ উম্মতের জন্য একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন,'হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর জন্ম হতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের বিপর্যয় ও ফিতনার চেয়ে বিরাট ফিতনা আর কোন কিছুই হবে না।' " (মুসলিম)

দাজ্জালের আলোচনা উম্মতের জন্য একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা দেখে থাকবেন, মুসলিম পরিবারগুলোতে মায়েরা যখন তাদের সন্তানদের অন্যান্য ইসলামী আকিদা ও বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন, তখন দাজ্জাল বিষয়েও ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখন শৈশবেই আপনার মায়ের জবানে আপনাকে দাজ্জালের ভয়ানক চিত্র আপনার কচি মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে থাকবে। এটি মুসলিম জাতির মায়েদের সেই প্রশিক্ষণ ছিল, যা সন্তানদেরকে ইসলামী বোধ-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে দিত না।

কিন্তু এখন সম্ভবত অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে এবং জাহেলী সভ্যতা আজকের মায়েদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারি থেকে অনেক উদাসীন করে দিয়েছে। তাছাড়া দাজ্জালের আবির্ভাবের যতগুলো লক্ষণ আছে, তার একটি লক্ষণ হল, সে সময় মানুষ দাজ্জালের আলোচনা ভুলে যাবে।

কাজেই আপনি যদি নিজেকে ও পরিবারের সদস্যদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা রাখেন, তাহলে এর জন্য ঘরে ঘরে দাজ্জালের আলোচনা অত্যন্ত জরুরী, যাতে আপনার কোলে বেড়ে ওঠা বংশধর তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু দাজ্জাল সম্পর্কে শৈশব থেকেই সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারে।

দাজ্জালঃ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি

দাজ্জাল বিষয়ক হাদিসগুলো বর্ণনা করার আগে দাজ্জাল সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের ধর্মীয় (বর্তমানে বিকৃত) গ্রন্থগুলোতে বিকৃত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আবশ্যক মনে করি। তাতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কাফের গোষ্ঠী ইহুদীদের ইঙ্গিতে যা কিছু করছে, তার প্রেক্ষাপট ও প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে আসবে।

দাজ্জাল সম্পর্কে ইহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সে ইহুদীদের সম্রাট হবে। সকল ইহুদীকে বাইতুল মুকাদ্দাসে আবাদ (প্রতিষ্ঠিত) করবে। সমগ্র বিশ্বের উপর ইহুদীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। পৃথিবীতে ইহুদীদের জন্য শঙ্কা অবশিষ্ট থাকবে না। সকল "সন্ত্রাসবাদী" কে নির্মূল করে ফেলবে এবং সর্বত্র শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ইজাখিলে আছেঃ

"হে ইহুদিকন্যা, তুমি আনন্দের সাথে চিৎকার দাও। ওহে জেরুজালেমের কন্যা, তুমি খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাও। ঐ দেখ তোমাদের রাজা আসছেন। তিনি ন্যায় পরায়ণ। তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসছেন। আমি ইউফ্রিম থেকে গাড়িকে আর জেরুজালেম থেকে ঘোড়াকে আলাদা করে ফেলব। যুদ্ধের পালক উপড়ে ফেলা হবে। তার শাসন সমুদ্র থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে"। (জাকারিয়াঃ৯ঃ৯ঃ১০)

"অনুরূপভাবে আমি ইসরাইলের প্রতিটি সম্প্রদায়কে সমগ্র পৃথিবী থেকে এনে একত্রিত করব, চাই তারা যেখানেই বসতি স্থাপন করুক। আমি তাদেরকে তাদেরই ভূখণ্ডে সমবেত করব। এই ভূখণ্ডে আমি তাদেরকে এক জাতির আকারে গড়ে তুলব ইসরাইলের পাহাড়ের উপর, যেখানে মাত্র একজন রাজা তাদের উপর রাজত্ব করবেন"। (ইজাখিলঃ৩৭ঃ২১ঃ২২)

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮৩ সালে চার্চের জেম বেকারের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আপনি একটু চিন্তা করুন, রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পর (পাশ্চাত্য ইউরোপ যা ১৯৯৩ সালে আরও সুসংগঠিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নামে একক পতাকা, একক মুদ্রা, ভিসাহীন ভ্রমণ) মাসীহ (দাজ্জাল) পুনরায় সেই লোকগুলোর উপর আক্রমণ চালাবে, যারা তাদের নগরী জেরুজালেমকে ধ্বংস করেছিল। তারপর তিনি সেই বাহিনীগুলোর উপর আক্রমণ চালাবেন, যারা মেগডন ও আরমাগেডনের উপত্যকায় সমবেত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জেরুজালেম পর্যন্ত এত রক্ত প্রবাহিত হবে যে, রক্ত ঘোড়ার লাগামের সমান হয়ে যাবে। এসব উপত্যকা যুদ্ধ সরঞ্জাম, জীবজন্তু, মানুষের জীবন্ত দেহ ও রক্তে ভরে যাবে।"

প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর পল ফান্ড লে বলেছেন, "একটি বিষয় আমার বুঝে আসছে না যে, মানুষ মানুষের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ কিভাবে করবে! কিন্তু সেদিন খোদা মানবীয় স্বভাবকে এই অনুমতি দিয়ে দিবেন যে, তোমরা তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রকাশ করে দাও। বিশ্বের উন্নত সবকটি শহর - লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলস ও শিকাগো অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে যাবে।"

টিভি বিশেষজ্ঞ হিস্টন বলেছেন, "বিশ্বের ভাগ্য সম্পর্কে মাসীহে দাজ্জালের ঘোষণা একটি আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্স থেকে প্রচার করা হবে। উক্ত কনফারেন্স স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভির পর্দায় দেখা যাবে।"

প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর মার্ক হেটেফিল্ড বলেছেন, “পবিত্র ভূমিতে (জেরুজালেমে) ইহুদীদের পুনরাগমনকে আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি যে, এটি মাসীহ যুগের আগমনের লক্ষণ, যে যুগে গোটা মানবতা একটি আদর্শ সমাজের কল্যাণে সুখময় জীবন লাভ করবে।”

“ফোর্সিং গডস হ্যান্ডস” নামক গ্রন্থের লেখিকা গ্রেস হল গেল বলেছেন, ‘...আমাদের গাইড কুব্বাতুস- সাখরার (ডোম অফ দ্যা রক) প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, আমাদের তৃতীয় হাইকেলটি (সোলায়মান হাইকেল বা সোলায়মান টেম্পল) আমরা ওখানে নির্মাণ করব। হাইকেল নির্মাণে আমাদের সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে। নির্মাণ সামগ্রী পর্যন্ত এসে পড়েছে। সেগুলো একটি গোপন স্থানে রাখা হয়েছে। বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান - যেগুলোতে ইসরাইলি কাজ চলছে - হাইকেলের জন্য দুর্লভ সব জিনিসপত্র তৈরি করছে। একটি ইসরাইলি প্রতিষ্ঠান রেশমের সুতা তৈরি করছে। সেগুলো দিয়ে ইহুদি পণ্ডিতদের পোশাক প্রস্তুত করা হবে’। (হতে পারে এগুলোই সেই তীজান বা সীজানওয়ালা চাদর, যার উল্লেখ হাদিসে এসেছে)।

লেখিকা আরও লিখেছেন, ‘আমাদের গাইড বলল, একথা ঠিক যে, আমরা শেষ সময়ের কাছাকাছি চলে এসেছি, যেমনটি আমি বলেছিলাম যে, কট্টর ইহুদিরা মসজিদটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, যার ফলে মুসলিম বিশ্ব আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। এটি হবে ইসরাইলের সঙ্গে একটি পবিত্র যুদ্ধ। এ বিষয়টি মধ্যখানে এসে হস্তক্ষেপ করতে মাসিহকে (দাজ্জাল) বাধ্য করবে।’
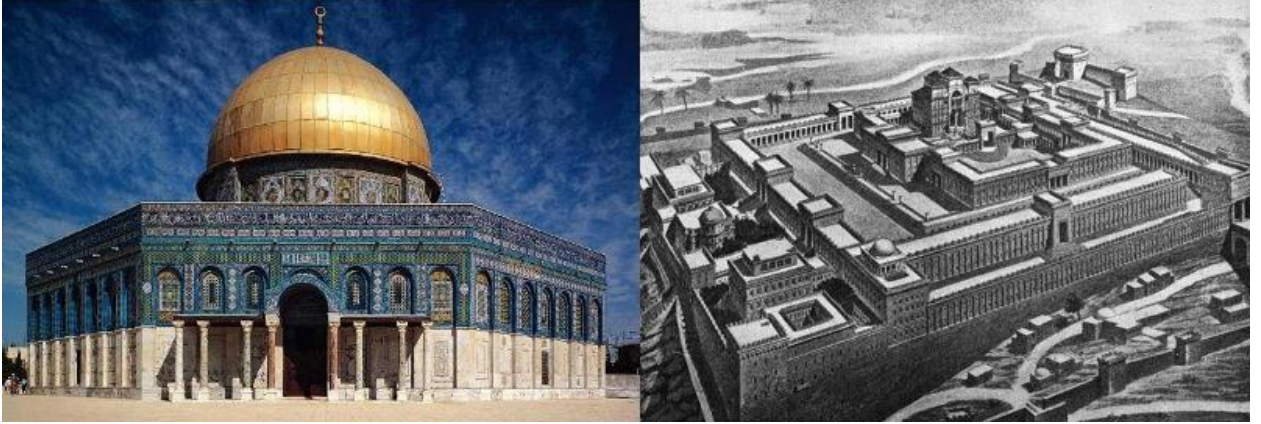
বামে - কুব্বাতুস সাখরার (ডোম অফ দ্যা রক), ডানে- সোলায়মান হাইকেল আর প্রাসাদ পুনর্নির্মাণের কাল্পনিক মডেল

১৯৯৮ সালের শেষের দিকে একটি ইসরাইলি সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে হাইকেলে সুলাইমানির চিত্র দেখানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের উপাসনালয়গুলোকে মুক্ত করা এবং তদসম্মুখে হাইকেল নির্মাণ করা। সংবাদপত্রে বলা হয়েছিল, এই হাইকেল নির্মাণের মোক্ষম সময়টি এসে পড়েছে। সংবাদপত্রে ইসরাইলি সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল, তারা যেন অধর্মীয় ইসলামি দখলদারিত্বকে মসজিদের স্থান থেকে অপসারণ করে। পত্রিকাটি আরও দাবি করেছে, তৃতীয় হাইকেল নির্মাণ খুবই সন্নিকটে।

গ্রেস হল সেন আরও লিখেছেন, ‘আমি লেন্ডা ও ব্রাউনের (ইহুদি) আবাসভুমিতে (ইসরাইলে) অবস্থান করি। একদিন সন্ধ্যায় আলাপকালে বললাম, উপাসনালয় নির্মাণের জন্য মসজিদে আকসা ধ্বংস করে দিলে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ইহুদি বলল, আপনার আশঙ্কা যথার্থ। এমন যুদ্ধই তো আমরা কামনা করি। কারণ, সেই যুদ্ধে আমরা জয়ী হব। তারপর আমরা সমস্ত আরবকে ইসরাইলের মাটি থেকে তাড়িয়ে দেব। আর তখনই আমরা আমাদের উপাসনালয়টিকে নতুনভাবে নির্মাণ করব।’

ইলহামের কিতাবের ষোলতম তথ্যে আছে, ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে। এভাবে প্রাচ্যের সম্রাটগণ অনুমতি পেয়ে যাবে যে, এই নদী পার হয়ে তোমরা ইসরাইল পৌঁছে যাও।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর “ভিক্টরি উইদাউট ওয়ার” নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের শাসকে পরিণত হবে এবং এই বিজয় তারা যুদ্ধ ছাড়াই অর্জন করবে। তারপর মাসিহ (দাজ্জাল) নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিবেন। যেন উল্লেখিত সন পর্যন্ত মাসিহর সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবে আর আমেরিকার দায়িত্ব এসব ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করা পর্যন্ত। তারপর মাসিহ রাজ্য পরিচালনা করবে।

লাখ লাখ মৌলবাদী খ্রিস্টানের বিশ্বাস হলো, ঈশ্বর ও ইবলিসের মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধটি তাদের জীবদ্দশাতেই শুরু হবে। তবে তাদের অধিকাংশের কামনা হলো, এই যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তাদেরকে তুলে নিয়ে জান্নাতে পৌছিয়ে দেওয়া হোক। খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা সামরিক প্রস্তুতিতে এত সোৎসাহ সহযোগিতা কেন করছে, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাঁর রহস্য উদঘাঁটিত হয়ে যাচ্ছে। এই পলিসি দ্বারা তারা দুটি লক্ষ্য অর্জন করেছে। প্রথমত, তারা আমেরিকানদেরকে তাদের ঐতিহাসিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে, যেটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এবং যার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। ভিসন থমাস তার এক গ্রন্থে লিখেছেন, ‘আরব বিশ্ব খ্রিস্টানদের একটি শত্রুজগত’।

খ্রিস্টানরাও কোন একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় অপেক্ষামাণ। আর ইহুদিরা এক্ষেত্রে বেশি বিচলিত। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৬৭ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের আগে ইহুদিরা দু’আ করত, হে খোদা, এ বছরটি আমাদেরকে জেরুজালেমে থাকতে দাও। আর এখন তারা প্রার্থনা করছে, হে খোদা, আমাদের মাসিহ যেন শীঘ্র এসে পড়েন।

মোটকথা, যে সব ভবিষ্যৎবাণী ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ইহুদীরা সেগুলোকে দাজ্জালের জন্য প্রমাণ করতে চায়। এক্ষেত্রে তারা খ্রিস্টানদেরকেও ধোঁকা দিচ্ছে যে, আমরা প্রতিশ্রুত মাসিহর অপেক্ষায় করছি আর মুসলমানরা হল মাসিহ’র বিরোধী। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। মুসলমান ও খ্রিষ্টান উভয়েই ঈসা ইবনে মরিয়মের অপেক্ষায় অপেক্ষামাণ। পক্ষান্তরে ইহুদীরা যার অপেক্ষা করছে, সে হল দাজ্জাল, ঈসা ইবনে মরিয়ম যাকে হত্যা করবেন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে খ্রিস্টানদের উচিত ছিল মুসলমানদের সঙ্গ দেওয়া – ইহুদীদের নয়। কেননা, ইহুদীরা তাদের পুরনো শত্রু।

দাজ্জালের ফেতনা হাদিসের আলোকে

দাজ্জালের ফেতনা কতটা ভয়াবহ একটি বিষয় দ্বারাই তার অনুমান করা যায় যে, স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং তিনি যখন সাহাবাগনের সম্মুখে এই ফেতনার আলোচনা করতেন, তখন তাদের মুখে ভয়ের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেত। প্রশ্ন হল, দাজ্জালের ফেতনায় সেই বিষয়টি কোনটি, যেটি সাহাবা কেরামকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল? সেটি কি ভয়াবহ যুদ্ধ, নাকি মৃত্যু? কিন্তু সাহাবা কেরামগন এ বিষ্যগুলোকে ভয় পাওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না।

সেই বিষয়টি হল, দাজ্জালের ধোঁকা এবং প্রতারণা। সে সময়টি এত ভয়াবহ হবে যে, বাস্তব অবস্থাটা আসলে কি তা বোঝাই সম্ভব হবে না। মানুষকে বিভ্রান্তকারী নেতার ছড়াছড়ি থাকবে। অপপ্রচারের অবস্থা এই হবে যে, মূহুর্তের মধ্যে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে। মানবতার শত্রুকে মুক্তিদাতা আর মুক্তিদাতাকে সন্ত্রাসী আক্যায়িত করা হবে।

এ কারনেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফেতনাকে খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। তার গঠন, আকৃতি ও আত্মপ্রকাশের স্থান পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সাধারণ মানুষ তো বটে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই ফেতনার আলোচনা একদম ছেড়ে দিয়েছে। অথচ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার এই ফেতনার আলোচনা করে বলেছেন, "আমি বিষয়টি তোমাদেরকে বারবার এইজন্য বর্ণনা করছি, যাতে তোমরা বিষয়টি ভুলে না যাও। তোমরা বিষয়টি উপলব্ধি করো, তাতে চিন্তা গবেষণা করো এবং অন্যদের কানে পৌছে দাও।"

দাজ্জালের গঠন-প্রকৃতি

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“পৃথিবীতে যত নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছে। দাজ্জাল কানা-ই হবে। আর তোমাদের রব অবশ্যই কানা নন। আর দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে ‘কাফিরুন’”। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৫৯৮)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে, যেন সেটি ফুলে থাকা আঙুর”। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৫৯০)

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে। মাথার চুলগুলো হবে ঘন ও এলোমেলো। তার সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। কিন্তু মূলত তার জাহান্নাম হল জান্নাত আর জান্নাত হল জাহান্নাম”। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৪৮)

দাজ্জালের চুল সম্পর্কে ফাহুল বারীতে আছেঃ ‘তাঁর মাথাটা যেন কোনও গাছের কতগুলো ডাল’।

অর্থাৎ - চুল পরিমাণে বেশি ও এলোমেলো হওয়ার কারণে মাথাটিকে গাছের ডাল পালার মত মনে হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, “দাজ্জালের একটি চোখ বসানো থাকবে। অপর চোখে মোটা দানা থাকবে। তাঁর দুই চোখের মাঝে ‘কাফিরুন’ লিখা থাকবে, যেটি লেখাপড়া জানা অজানা সব মুমিন পড়তে পারবে”। (মিশকাত শরীফ, খণ্ড ৩, হাদিস নং ৫২৩৭)

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় একথাও আছে যে, “তাঁর সঙ্গে দুজন ফেরেশতা থাকবে। তারা দুজন নবীর আকারে তার হাতে থাকবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি চাইলে উক্ত দুই নবী ও তাদের পিতাদেরও নাম বলতে পারবো। তাদের একজন দাজ্জালের ডান দিকে, একজন বাঁ দিকে থাকবে। এটি হবে পরীক্ষা।

দাজ্জাল বলবে, আমি তোমাদের রব নই কি? আমি কি মৃতকে জীবিত করতে পারি না? আমি কি মৃত্যু দিতে পারি না? উত্তরে এক ফেরেশতা বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ। তার এই উক্তি দ্বিতীয় ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। ফলে দ্বিতীয় ফেরেশতা তার উত্তরে বলবে, তুমি ঠিকই বলেছ। দ্বিতীয় ফেরেশতার এই উক্তি সবাই শুনতে পাবে এবং ধরে নিবে, এই ফেরেশতা দাজ্জালকে সত্যায়ন করছে। এটিও হবে একটি পরীক্ষা”। (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২২১)

দাজ্জাল সুনির্দিষ্ট এক ব্যক্তি হবে। কারণ, হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই কোন রাষ্ট্রকে দাজ্জাল মনে করা ঠিক নয়। যেমনটি খাওয়ারিজ ও জাহমিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলসমূহ মনে করে থাকে।

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেছেন, ‘ইমাম মুসলিম প্রমুখ দাজ্জালের কাহিনীতে এই যে হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন, এগুলো প্রমাণ করছে, দাজ্জালের অস্তিত্ব যথার্থ এবং সে সুনির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি হবে’।

দাজ্জালের উভয় চোখ ত্রুটিপূর্ণ হবে

দাজ্জালের চোখ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা এসেছে। কোথাও তার ডান চোখ কানা বলা হয়েছে। কোথাও বাম চোখ। এ বিষয়ে মুফতি মুহাম্মদ রফী' উসমানী সাহেব 'আলামতে কেয়ামাত ওয়া নুযূলে মাসিহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "সার কথা হল, দাজ্জালের দুই চোখই ত্রুটিপূর্ণ হবে। বায়েরটি একদম জ্যোতিহীন ও মোছানো আর ডানেরটি কোঠর থেকে বের হওয়া থাকবে আঙ্গুরের মতো।

হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানি (রহঃ) 'তাফিয়া'র ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, দাজ্জালের ডান চোখটি বাইরে বের হওয়া থাকবে। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩২৫)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাজ্জালের চোখ সিসার মতো সবুজ হবে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২১১৮৪; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৭৯৫)

বর্তমান যুগে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির লোগোতে আপনি একটি চোখ দেখতে পাবেন। কোথাও চোখটি শাদা, যেন চমকানো তারকা। আবার কোথাও চোখটির রং সবুজ দেখানো হয়, যেন সবুজ সিসা। আর এই ওয়ান আই সিম্বল যাকে "All Seeing Eye" সিম্বল বলা হয়, এই সিম্বল কোম্পানির লোগোতে ব্যাবহার করা হচ্ছে এমন কোম্পানির সংখ্যা নেহায়েত কম না বরং তার সংখ্যা সত্যিই অবাক করা। দাজ্জালের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব ব্যাবস্থা মানুষের মন মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের অজান্তেই কালচারিং করার জন্য (যাতে মানুষকে এই বিশ্ব ব্যাবস্থার জন্য প্রস্তুত করা যায়) দাজ্জালের অনুসারীরা তাদের একটি সিম্বল "All Seeing Eye" কত বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে তা বুঝার জন্য নিচে অসংখ্য ছবি থেকে বাছাই করা কিছু ছবি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেখানো হল।

<u>মুভি :</u>

Movie : Being There (1979)

Movie : Brazil (1985)

Movie : Citizen Kane (1941)

Movie : Gangs of New York (2002)

Movie : Lara Croft

মুভি পোস্টার

বাম থেকে ডানে : Brother's War (2009), The Lord of the Rings: The Two Towers (2002), National Treasure (2004)

টিভি নেটওয়ার্ক এবং টিভি শো

বামে : আমেরিকান টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক CBS এর লোগো, ডানে : বাংলাদেশী চ্যানেল – চ্যানেল আই

টিভি শো (বাম থেকে ডানে) : South Park, Bigg Boss, Samurai Jack

<u>রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান</u>

বামে: European Uunion official logo, ডানে: Consilium (Council of the European Union)

বামে: Virtual Global Taskforce এর লোগো, ডানে: The Information Awareness Office এর লোগো

কমিকস:

গেমিং :

লন্ডন অলিম্পিক গেমস (২০১২) এর মাস্কট

Wii
Wi-Fi
THE CONDUIT
SPECIAL EDITION
TEEN
T
ESRB
Online Interactions
Not Rated by the ESRB
SEGA

স্থাপত্য :

Israel Supreme Court

বামে: ক্যাথোলিক চার্চ (পোল্যান্ড), ডানে: অর্থোডক্স আল্টার

বামে: ম্যানিলা ক্যাথেড্রাল এর সামনের দরজা, ডানে: রোমানিয়ায় একটি অর্থোডক্স ক্যাথেড্রোলের ছাদে চিত্রিত "All Seeing Symbol"

কোম্পানি লোগো ও সার্ভিস

Nike Mojo 2013 Golf Balls 24-Pack
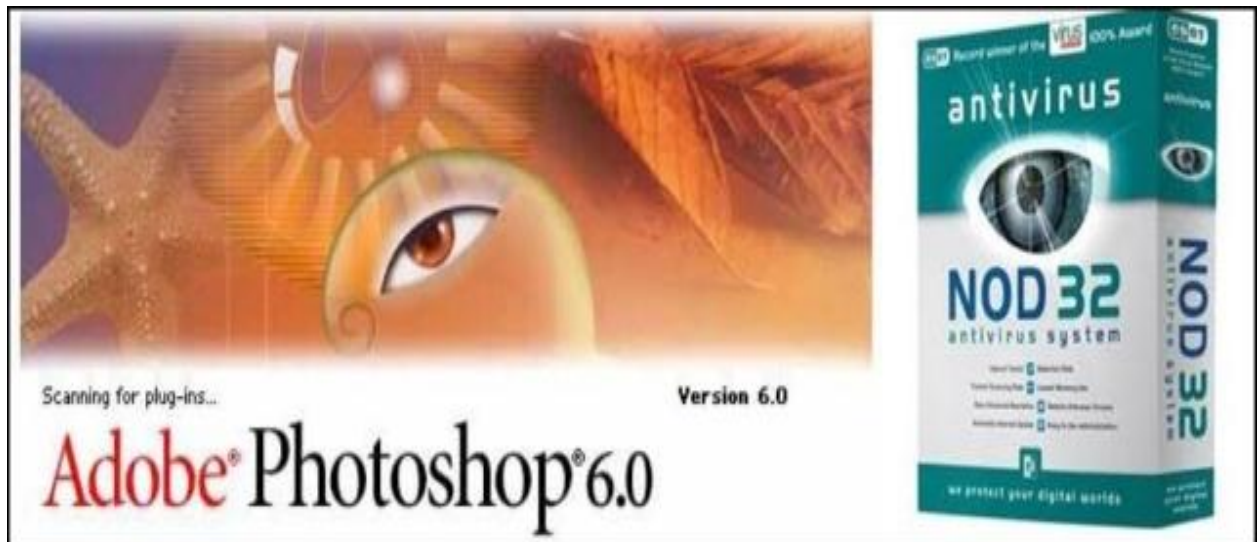
বামে : Internet provider Alice, ডানে : Island Transportation corp logo

টাট্টু

বই এবং ম্যাগাজিন

UNABRIDGED
WARREN BUFFETT'S
MANAGEMENT SECRETS
READ BY
MARY BUFFETT
PROVEN TOOLS FOR PERSONAL
AND BUSINESS SUCCESS
MARY BUFFETT & DAVID CLARK
Bestselling Authors of
BUFFETTOLOGY®, THE TAO OF WARREN BUFFETT,
and WARREN BUFFETT AND THE
INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS

TIME
THE WEEKLY NEWSMAGAZINE

মিউজিক
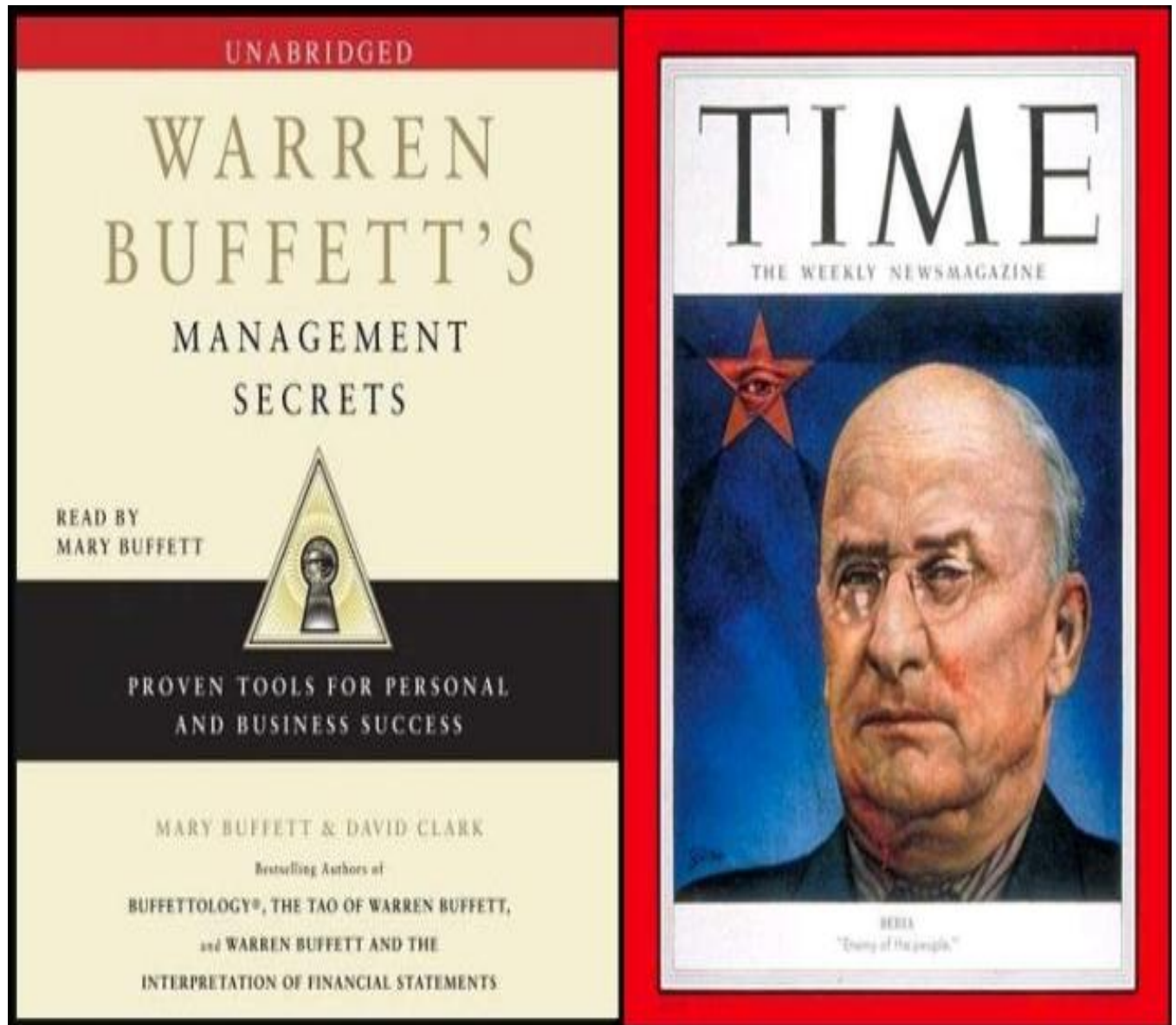
বাম থেকে ডানে : Train of Thought (by Dream Theater), Earth, Wind and Fire ব্যান্ডের গ্রেটেস্ট হিটস কম্পাইলেশন, Touched by the Crimson King (by Demons and Wizards)

বাম থেকে ডানে : Blood Money (by Mobb Deep), আমেরিকান ব্যান্ড Yeah Yeah Yeahs এর লাইভ পারফরম্যান্স, ব্রিটিশ রক ব্যান্ড Duran Duran এর সিঙ্গেলস কম্পাইলেশন।

অন্যান্য :

EON card

আমেরিকান ডলার

বিখ্যাত র‍্যাপার এমিনেম এর স্পেশাল পোজ, আপাতত দৃষ্টিতে একে "স্টাইলিশ" (যাকে অনেকে মজা করে ইয়ো ইয়ো পোজ ও বলে) পোজ মনে হলেও এখানে দুটো সাইন আছে, একটি হল "All Seeing Eye" এবং আরেকটি "The Devil's Horn (El Diablo)"। মুসলিম তরুন ও যুবকদের মধ্যে এর অন্ধ অনুকরণ দেখা যায়।

তবে এবার আপনারা যে ছবি দুটো দেখতে যাচ্ছেন তা দেখার পর অনেকেই হতভম্ব হয়ে যাবেন। যে ভুখন্ডে রয়েছে আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরিফ, যে পবিত্র ভুখন্ডে শুয়ে আছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সেখানকার অর্থাৎ সৌদি আরবের পুলিশের ব্যাজও এই দাজ্জালিক সিম্বল থেকে বাদ যায় নি।
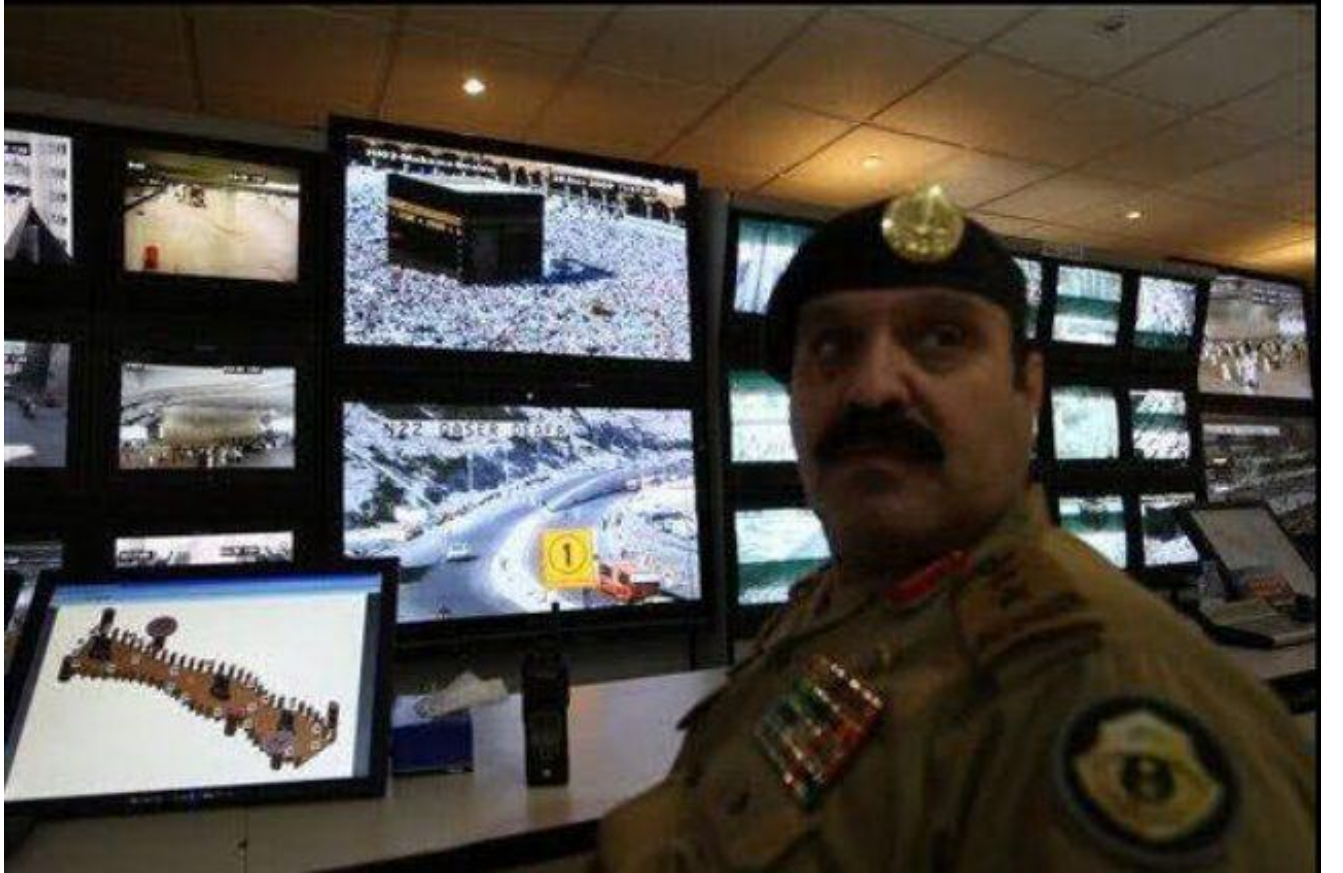
এটি কি নিছক কাকতলীয় ঘটনা যে, এই কোম্পানিগুলো একটি ত্রুটিপূর্ণ চোখকে তাদের কোম্পানির মনোগ্রাম হিসাবে বেছে নিয়েছে? নাকি বুঝে শুনে এখন থেকেই তারা জনগণকে এই ত্রুটিপূর্ণ চোখটির সঙ্গে পরিচিত করে তুলছে?

আলোচ্য হাদিসে আছে, দাজ্জালের কপালে 'কাফিরুন' লিখা থাকবে। এখানে কথাটির প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোন কোম্পানির নাম কিংবা কোন রাষ্ট্রের পতাকা।

ইমাম নববি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, বিজ্ঞ আলেমগনের মতে সঠিক হল, উল্লেখিত লিখাটি বাস্তব। আল্লাহপাক একে দাজ্জালের মিথ্যাবাদী হওয়ার অকাট্য চিহ্ন হিসাবে স্থির করেছেন।

প্রতিজন মুমিন এই লেখাটি পড়তে পারবে। প্রশ্ন জাগে, সবাই যখন পড়তে পারবে, তখন মানুষ তার ফেতনায় আক্রান্ত হবে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হল, সেই হাদিস, যাতে বলা হয়েছে, পরিচয় পাওয়া সত্বেও বহু মানুষ আপন জাগতিক স্বার্থের খাতিরে দাজ্জালের সঙ্গ দিবে।

আরেকটি উত্তর এই হতে পারে যে, পড়তে পারা আর লেখার মর্ম বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করা এক কথা নয়। বর্তমান যুগেও বহু মুসলমান এমন আছে, যারা কুরআনের বিধানাবলী পড়ে, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করে না। জানে, কিন্তু মানে না। সবাই জানে, সুদি ব্যবস্থা সরাসরি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ। কিন্তু বহু মানুষ কার্যত সুদের সাথে জড়িত।

দাজ্জালের যুগেও বহু মানুষ মুদ্রা ও জাগতিক সৌন্দর্যের বিনিময়ে নিজের ঈমান বিক্রি করে ফেলবে। তারা ঈমান পরিত্যাগ করে দুনিয়াকে বরণ করে নেবে। কাজেই যারা আল্লাহর নামে জীবন বিলানোর পরিবর্তে দাজ্জালের সম্মুখে মাথানত করে ফেলবে, তারা দাজ্জালের কপালের 'কাফিরুন' লিখাটি দেখতে পাবে না। বরং তাকে তারা 'যুগের মাসিহ' ও 'মানবতার মুক্তির সনদ' আখ্যা দেবে এবং এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ খুঁজে বেড়াবে। যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাদেরকে তারা বিভ্রান্ত বলবে। তারপরও নিজেদের ব্যাপারে দাবি করবে, আমরা মুসলমান। অথচ ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনোই সম্পর্ক থাকবে না। এসব এ জন্যই হবে যে, বদ আমল ও আত্মিক ব্যাধির কারণে তাদের ঈমানি শক্তি রহিত হয়ে যাবে।

এই উত্তর আমি নিজের পক্ষ থেকে দিচ্ছি না। এটি আমার মন গড়া কথা নয়। বরং বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববি (রহঃ) এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

হাফিজ ইবনে হাজর (রহঃ) ফাতহুল বারীতে লিখেছেনঃ "সেদিন আল্লাহ লেখাপড়া জানা ব্যতিরেকেই মুমিনদের জন্য বুঝ তৈরি করে দিবেন"।

ইমাম নববি লিখেছেনঃ "সেদিন আল্লাহ মুমিনদের জন্য উক্ত লেখাটি প্রকাশ করে দেবেন আর বদকার লোকদের জন্য গোপন করে রাখবেন"।

দাজ্জালের বাহন ও তার গতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাজ্জালের গাধার (বাহনের) মাঝে চল্লিশ গজের দূরত্ব থাকবে এবং এক একটি পদক্ষেপ তিনদিনের ভ্রমণের সমান হবে। সে তার গাধার পিঠে আরোহণ করে সমুদ্রে এমনভাবে ঢুকে যাবে, যেমন তোমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পানির ছোট নালায় ঢুকে থাক (এবং নালা পার হয়ে থাক)। সে দাবি করবে, আমি বিশ্বজগতের রব এবং সূর্যটা আমার কথা মত চলছে। তোমরা কি চাচ্ছ যে আমি একে থামিয়ে দেই? তার কথায় সূর্য থেমে যাবে। এমনকি একটি দিন মাস ও সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এবার সে বলবে, তোমরা কি চাচ্ছ, আমি এটিকে আবার চালিয়ে দেই? লোকেরা বলবে, হ্যাঁ দিন। তখন দিন ঘণ্টার সমান হয়ে যাবে।

তার কাছে এক মহিলা আসবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি আমার পুত্র এবং স্বামীকে জীবিত করে দিন। তখন শয়তানরা মহিলার পুত্র ও স্বামীর আকৃতিতে এসে হাজির হবে। মহিলা শয়তানকে গলায় জড়িয়ে ধরবে এবং তার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে। মানুষের ঘরগুলো শয়তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এক গ্রাম্যলোক দাজ্জালের নিকট আসবে এবং বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের জন্য আমাদের উট ও বকরিগুলোকে জীবিত করে দিন। দাজ্জাল তাদেরকে উট-বকরির আকৃতিতে কতগুলো শয়তান দিয়ে দেবে। এই পশুগুলো ঠিক সেই বয়স ও সেই শরীর স্বাস্থ্যের হবে, যেমনটি তাদের মৃত উট বকরিগুলো ছিল। এসব দেখে গ্রামের অধিবাসীরা বলবে, ইনি যদি আমাদের রব না হতেন, তাহলে আমাদের মৃত উট বকরিগুলোকে কোনক্রমেই জীবিত করতে পারতেন না।

দাজ্জালের সঙ্গে ঝোল ও গোশতওয়ালা হাড়ের পাহাড় থাকবে, যেগুলো সব সময় গরম থাকবে – কখনও ঠাণ্ডা হবে না। আর প্রবাহমান নহর থাকবে। একটি পাহাড় থাকবে বিভিন্ন ফল ও সবজির বাগানের। একটি পাহাড় থাকবে আগুন ও ধোঁয়ার। সে বলবে, এটি আমার জান্নাত আর এটি আমার জাহান্নাম। এগুলো আমার খাদ্য এবং এগুলো আমার পানীয়। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গে থাকা লোকদের লোকদেরকে সতর্ক করবেন যে, এই লোকটিই মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। আল্লাহ তাঁর উপর লা'নত বর্ষণ করুন। তোমরা তার কবল থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ ঈসা (আঃ) কে অনেক তীব্র গতি দান করবেন। ফলে দাজ্জাল তাঁর নাগাল পাবে না।

তো দাজ্জাল যখন বলবে, আমি সমগ্র জগতের রব, তখন মানুষ বলবে তুমি মিথ্যাবাদী। উত্তরে হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন, মানুষ সত্য কথা বলেছে। তারপর ঈসা (আঃ) মক্কার দিকে আসবেন। সেখানে তিনি বড় এক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত পাবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কে? তিনি উত্তর দেবেন, আমি মিকাঈল; দাজ্জালকে হারাম শরীফ থেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরন করেছেন। তারপর ঈসা (আঃ) মদিনার দিকে আসবেন। সেখানেও তিনি বড় এক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত পাবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কে? তিনি উত্তর দেবেন, আমি জিব্রাঈল; দাজ্জালকে রাসুলের হারাম থেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরন করেছেন।

এবার দাজ্জাল মক্কার দিকে অগ্রসর হবে। এসে যখন মিকাঈল (আঃ) কে দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যাবে এবং পবিত্র হারাম শরীফে ঢুকতে ব্যর্থ হবে। তবে সে বিকট সন্দে একটি চিৎকার দেবে, যার ফলে প্রতিজন মুনাফিক নারী ও মুনাফিক পুরুষ মক্কা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের কাছে চলে যাবে। তারপর দাজ্জাল মদিনার দিকে আসবে। কিন্তু

যখন জিব্রাঈলকে দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যাবে। কিন্তু সেখানেও সে সজোরে একটা চিৎকার দেবে। সেই চিৎকার শুনে প্রতিজন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মদিনা থেকে বের হয়ে তার কাছে চলে যাবে।

এক তথ্যসরবরাহকারী মুসলমান মুসলমানদের এই দলটির কাছে আসবে, যারা কুনুস্তুনিয়া (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয় করেছে এবং যাদের সঙ্গে সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলমানদের সম্প্রীতি থাকবে। বলবে, অচিরেই দাজ্জাল তোমাদের কাছে এসে পৌঁছাবে। শুনে তারা বলবে, আসুক, আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকো। দূত বলবে, না, আমাকে অন্যদেরও সংবাদটা পৌঁছুতে হবে। কিন্তু এই লোকটি যখন ফেরত রওনা হবে, তখন দাজ্জাল তাকে ধরে ফেলবে এবং বলবে, এই সেই লোক, যে মনে করে, আমি তাকে কাবু করতে পারবো না। নাও একে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলো। এই মুসলিম দূতকে করাত দ্বারা চিড়ে ফেলা হবে।

তারপর দাজ্জাল (জনতাকে উদ্দেশ্য করে) বলবে, আমি যদি এই লোকটিকে তোমাদের সামনে জীবিত করে দেই, তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে, আমি তোমাদের রব? জনতা বলবে, আমরা তো আগে থেকেই জানি, আপনি আমাদের রব। তারপরও এই বিশ্বাসটিকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দাজ্জাল লোকটিকে জীবিত করে তুলবে। লোকটি আল্লাহর ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ এই লোকটি ব্যতীত আর কারও ক্ষেত্রে দাজ্জালকে এই শক্তি দেবেন না যে, কাউকে হত্যা করে সে আবার তাকে জীবিত করবে।

তারপর দাজ্জাল মুসলমান দূতকে বলবে, আমি কি তোমাকে হত্যা করে জীবিত করিনি? কাজেই আমি তোমার রব। উত্তরে দূত বলবে, এখন তো আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি যে, আমিই সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে নবীজি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে এবং পরে আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করবে। আর আল্লাহ আমাকে ব্যতীত আর কাউকে পুনরায় জীবিত করবেন না। তারপর উক্ত দূতের গাঁয়ে তামার চাদর জড়িয়ে দেওয়া হবে, যার ফলে দাজ্জালের কোন অস্ত্র তার উপর ক্রিয়া করবে না। না তরবারি, না ছুরি, না পাথর, না অন্য কোন অস্ত্র। ফলে দাজ্জাল বলবে, একে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আল্লাহ দাজ্জালের আগুনের পর্বতটিকে সবুজ শ্যামল বাগিচায় পরিণত করে দেবেন (কিন্তু দর্শকরা মনে করবে, ওকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে)। মানুষ সংশয়ে নিপাতিত হবে।

তারপর দাজ্জাল দ্রুত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এগিয়ে যাবে। যখন সে আফীকের চূড়ায় আরোহণ করবে, তখন তার ছায়া মুসলমানদের উপর পতিত হবে। (ফলে মুসলমানরা তার আগমন টের পেয়ে যাবে) সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাদের ধনুকগুলোকে ঠিকঠাক করে নেবে। (সেই দিনটি এত কঠিন হবে যে), সেদিন সেই মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী মনে করা হবে, যারা ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণে (বিশ্রামের লক্ষ্যে) সামান্য সময়ের জন্য থেমে যাবে বা বসে পড়বে। (অর্থাৎ যত শক্তিশালী যোদ্ধাই হোক, ঘোরতর যুদ্ধ লড়ার কারণে সামান্য সময়ের জন্য হলেও সে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হবে)। এই অবস্থায় মুসলমানরা ঘোষণা শুনবে - লোকসকল, তোমাদের কাছে সাহায্য (হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম) এসে পড়েছে”। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৩)

দাজ্জালের এক একটি পদক্ষেপ তিনদিনের সফরের সমান হবে। হিসাব করে পাওয়া গেছে, এই পরিমাণটা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮২ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ২ লাখ ৬৫ হাজার ২ শত কিলোমিটার। হিসাবটা এভাবে বের করা হয়েছে যে, তিন দিনের শরয়ী সফর হল ৪৮ মাইল। ৪৮ মাইলে ৮২ কিলোমিটার। এই হিসাবের অর্থ দাঁড়ায়, দাজ্জাল সেকেন্ডে ৮২ কিলোমিটার গতিতে ভ্রমণ করবে। মুসলিম শরীফে নাওয়াস ইবনে সাম'আন এর বর্ণনায় দাজ্জালের গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যেন সেই বৃষ্টি, বায়ু যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়'।

‘আফীক’ একটি পাহাড়ি সড়কের নাম, যেখানে জর্ডান নদী তারবিয়া উপসাগর থেকে বের হয়েছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল এই অঞ্চলটির দখল হাতে নিয়েছিল। ‘আফীক’ এর আরেক নাম আছে ‘এমটি পিটার্স’। বাইবেলের ভাষ্য মোতাবেক ‘আফীক’ সেই জায়গা, যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্যাপ্টিজমের জন্য বহু মানুষ গিয়ে থাকে’। (এন্সাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটেনিকা)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, “দাজ্জালের গাধার কানগুলো এত বড় হবে যে, সত্তর হাজার মানুষ তার তলে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে”। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪৮)

হযরত কা’ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, “দাজ্জাল যখন উর্দুনে (জর্ডানে) আসবে, তখন তূর পাহাড়, ছাওর পাহাড় ও জুদি পাহাড়কে ডাকবে। এমনকি এই তিনটি পাহাড় পরস্পর এমনভাবে সংঘাতে লিপ্ত হবে, যেমন দুটি ষাঁড় কিংবা ছাগল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়”। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৩৭)

দাজ্জালের অর্থনৈতিক প্যাকেজ

হযরত ওবায়েদ ইবনে উমায়ের আল-লায়াছি বলেছেন, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। তখন কিছু মানুষ তার অনুসারী হয়ে যাবে। তারা বলবে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, দাজ্জাল নিঃসন্দেহে কাফের; তবে তার খাদ্য ভাণ্ডার থেকে খেতে এবং তার বাগানে পশুপাল চড়াতে তার অনুসারী হয়েছি। পরবর্তী সময়ে যখন আল্লাহর গজব নাজিল হবে, তা তাদের সকলের উপর নাজিল হবে। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪৬)

আজ মুসলমান এই হাদিসগুলোতে চিন্তা করে না। যদি আমরা চিন্তা করি, তা হলে গোটা সুরতহাল স্পষ্ট হয়ে যাবে। আজও কি এমনটি হচ্ছে না যে, বাতিলের পরিচয় জানা সত্বেও অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মুসলমান বাতিলের সঙ্গ দিচ্ছে, বাতিলকে সহযোগিতা দিচ্ছে কিংবা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে?

হযরত শাহ্র ইবনে হাওশাব (রাঃ), আসমা বিনতে যায়ীদ আনসারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আসমা (রাঃ) বলেছেন, একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। তিনি বলেছেন, তার ফেতনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনাটি এই হবে যে, সে এক গ্রাম্য লোকের নিকট আসবে এবং বলবে, তোমার খেয়াল কি; আমি যদি তোমার মৃত উটটি জীবিত করে দেই, তাহলে কি তুমি মেনে নিবে আমি তোমার রব? গ্রাম্য লোকটি বলবে, হ্যাঁ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারপর শয়তানরা তার মৃত উটটিকে ঠিক আগের মতো বরং তার চেয়েও উত্তম – যেমন দুগ্ধদায়িনী ভরাপেট ছিল তেমন বানিয়ে দিবে।

অনুরূপভাবে দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকট আসবে, যার পিতা ও ভাই মারা গেছে। তাকে বলবে, তোমার ধারণা কি; আমি যদি তোমার বাপ ভাইকে জীবিত করে দেই, তাহলে কি তুমি মেনে নিবে আমি তোমার রব? উত্তরে সে বলবে, কেন নয়। ফলে, তারপর শয়তানরা লোকটির পিতা ভাইয়ের আকৃতিতে এসে হাজির হবে।

এ পর্যন্ত বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক কাজে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষন পর ফিরে এলেন। তখন লোকেরা এ ঘটনায় বিষণ্ণ ও বিচলিত ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার চৌকাঠ দুটো ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, কি হয়েছে আসমা? উত্তরে আসমা (রাঃ) বললেন, দাজ্জালের আলোচনা করে আপনি আমাদের কলিজাটা বের করে দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ও যদি আমার জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে আমি তার জন্য বাঁধা হয়ে যাব। অন্যথায় আমার রব প্রতিজন মুমিনের হেফাজতকারী হবেন। তারপর আসমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা যখন আটা খামির করি, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত রুটি তৈরি করি না, যতক্ষণ না আমদের ক্ষুধা লাগে। তো সে সময় ঈমানদারদের অবস্থা কি হবে? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের জন্য সেই তসবীহ তাহমীদই যথেষ্ট হবে, যা আকামের অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৩৫)

এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদও বর্ণনা করেছেন। তবে উভয় বর্ণনায় শব্দের কিছু তারতম্য আছে। তাতে অতিরিক্ত এই কথাটিও আছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যারা আমার মজলিসে উপস্থিত হয়েছ এবং আমার বক্তব্য শুনেছ, তোমরা এই কথাগুলোকে সেই লোকদেরও কানে পৌঁছিয়ে দিও, যারা এই মজলিসে উপস্থিত নেই'।

মুসনাদে তায়ালিসিতে এই বর্ণনাটি শাহ্র ইবনে হাওশাব এর সনদ ব্যতীত অন্য সনদে উল্লেখিত হয়েছে।

আবু উমামা থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে- ‘ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা- মাতাকে জীবিত করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে?’ বেদুইন বলবে - ‘না!’ অতঃপর দু’ - জন শয়তান তার পিতা- মাতার রূপ ধরে তাকে বলবে- ‘ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর! সে তোমার প্রভু!’ ” (ইবনে মাজাহ - ৪০৬৭, সহিহ আল- জামি আল- সগীর - ৭৭৫২, মুস্তাদরাকে হাকিম)

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) দাজ্জাল বিষয়ক বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি এ বিষয়টি বারবার এজন্য বর্ণনা করছি, যেন তোমরা বিষয়টিতে গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা গবেষণা কর, সজাগ সচেতন হও, সে মোতাবেক কাজ কর এবং বিষয়টি তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আলোচনা কর। কারণ, দাজ্জালের ফেতনা ভয়াবহতম একটি ফেতনা।” (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

উল্লেখ্য যে, দাজ্জালের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভবত নতুন মুদ্রাব্যবস্থা বাজার জয় করতে আসছে, যাকে বিটকয়েন নাম দেওয়া হয়েছে। বিটকয়েনের অফিশিয়াল সাইট থেকে আপনারা এটা সম্পর্কে তথ্য পাবেন, তবে অবশ্যই সব তথ্য না। যেমন মার্কিন প্রাক্তন রাজনীতিবিদ রন পলের মতো আরও অনেকেই ধারণা করছে যে বিটকয়েন মার্কিন ডলারের জন্য হুমকিস্বরূপ। ইতিমধ্যেই এই বিটকয়েন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে অনেক বড় মাথার মানুষই এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করছেন। তবে মুমিন হিসেবে আমাদের অবশ্যই কোন সম্ভাবনা উড়িয়ে না দিয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করতে হবে।

দাজ্জালের ধোঁকা ও প্রতারণা

যেমনটি আগে বলা হয়েছে, দাজ্জালের প্রতারণা হবে বহুমুখী। মিথ্যাচার, প্রতারণা, গুজব ও প্রোপাগান্ডা এত বেশি হবে যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বে যে, লোকটি মাসিহ, নাকি দাজ্জাল?

সাধারণত মানুষের ধারণা হল, দাজ্জাল শুধু কুৎসিত একটি চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। বিষয়টি যদি এত সহজ হতো, তা হলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। সত্য হল, কুৎসিত মুখাবয়ব সত্ত্বেও তার কর্মকান্ড বিশ্বের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে যে, মানুষ ভাবতে বাধ্য হয়ে পড়বে, যদি এই লোকটি দাজ্জাল হতো, তাহলে এমন ভালো কাজ কখনও করত না। জগতে আবির্ভূত হয়ে সে এত বেশি ফেতনার জন্ম দিবে, যার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তবে বিভিন্ন হাদিসের আলোকে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করছি যে, দাজ্জালের কর্মপদ্ধতি কোন ধরনের হতে পারে।

১। দাজ্জালের আবির্ভাবের আগের বছরগুলোতে পৃথিবীতে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও গণহত্যা চলতে থাকবে। বেকারত্ব, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূল্য ও সামাজিক অবিচারের রাজত্ব চলবে। পরিবারে শান্তি ও নিরাপত্তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সর্বত্র পাপ ও মন্দের জয়জয়কার হবে। কোথাও কোথাও কিছু সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র চোখে পড়বে। মানুষ এমন লোকেরও প্রশংসা করবে, যে ৯৯ ভাগ পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত; মাত্র ১ ভাগ সৎকাজ করছে। নেতাদের থেকে নিরাশ হয়ে মানুষ এমন কোন মুক্তিদাতার সন্ধানে থাকবে, যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হবে।

২। এবার দাজ্জালের চেলা মিডিয়া বা অন্য কোন উপায়ে এক নেতাকে মানবতার মুক্তিদাতা বানিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করবে এবং প্রমাণ করবে যে, ইনি বেকারদের কর্মসংস্থান দিয়েছেন, দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চলগুলোতে পানাহারের উপকরণ পৌঁছে দিয়েছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চলমান বিদ্বেষ ও শত্রুতা দূর করে তাদেরকে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের পথে তুলে দিয়েছেন, পৃথিবী থেকে অপরাধপ্রবণ লোকদের নির্মূল করেছেন, ঘরে ঘরে ন্যায় বিচার পৌঁছে দিয়েছেন, যার ফলে এখন পৃথিবীর সকল জাতিকে এক চোখে দেখা হচ্ছে। এভাবে সে নিজেকে খোদা দাবি করার আগে বিশ্ববাসীর সমর্থন ও সহমর্মিতা অর্জন করে নেবে। বলা বাহুল্য, এই যুগে যদি কোন ব্যক্তি এতগুলো মহৎ কর্ম আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়, তা হলে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় আস্থাশীল বিশ্ব তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে বাধ্য হবে। এভাবে মানুষের সমর্থন ও সহমর্মিতা তার সঙ্গী হয়ে যাবে।

৩। তারপর দাজ্জাল সর্বপ্রথম মানুষের মন মস্তিষ্কে এই বুঝ ঢুকিয়ে দিবে যে, সে নিজেই রব এবং সে নিজেকে ‘রব’ দাবি করে বসবে।

দাজ্জালের অবস্থানে সময় থেমে যাবে কি?

সময়ের থেমে যাওয়া দাজ্জালের জাদুর ক্রিয়া হবে কিংবা সে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এমনটি করবে। কেননা, সাহাবা কিরাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, এই অবস্থায় আমরা নামাজ কত ওয়াক্ত পড়ব? তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন, সময় অনুমান করে নামাজ আদায় করতে থাকবে।

দাজ্জালি শক্তিগুলো সময়ের গতিকে রোধ করার লক্ষ্যে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, 'টাইম মেশিন' নামে এমন একটি প্রযুক্তি আবিস্কারের চেষ্টা চলছে, যার সাহায্যে মানুষকে বিগত সময়ে পৌঁছে দেওয়া যায়। মানুষ মূলত বর্তমান সময়েই অবস্থান করবে; কিন্তু মেশিনটির সাহায্যে মনে হবে, এখনও বিগত সময়ের মধ্যেই রয়েছে। এর স্পষ্ট চিত্র হয়তো শীঘ্রই বিশ্ববাসীর সামনে চলে আসবে।

সাহাবাগনের দাজ্জালের গতি ও দুনিয়াতে তার অবস্থানের মেয়াদকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা তাদের সামরিক চিন্তার প্রমাণ বহন করে। প্রশ্নটি করে তারা জানতে চেয়েছিলেন, আমাদেরকে দাজ্জালের সাথে কতদিন যুদ্ধ করতে হবে। যেহেতু যুদ্ধে চলাচল এবং দৌড়ঝাঁপ একটি অতিশয় গুরুত্তপূর্ন বিষয়, তাই তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, দাজ্জালের গতি কেমন হবে?

দাজ্জালের মেয়াদকালের প্রথম দিনটি এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান হবে আর তৃতীয় দিনটি দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট ৩৭ দিন সাধারণ দিবসের মতো হবে। এই হিসাবে দাজ্জালের দুনিয়াতের অবস্থানের মেয়াদকাল এক বছর দুই মাস চৌদ্দ দিনের সমান হয়।

একদিন এক বছরের সমান হবে। কোন কোন বিশ্লেষক দিবসের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই লিখেছেন যে, পেরেশানির কারণে দিনটি দীর্ঘ বলে মনে হবে।কিন্তু মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববি (রহঃ) লিখেছেন, হাদিস বিশেষজ্ঞদের মতে হাদিস দ্বারা বাহ্যত যা বোঝা যাচ্ছে, বাস্তবে তা- ই এর মর্ম। অর্থাৎ প্রথম তিনটি দিন এতটাই দীর্ঘ হবে, যা হাদিসে বলা হয়েছে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনেরই মতো হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিই তার প্রমাণ বহন করে। তা ছাড়া সাহাবা কিরাম এই যে প্রশ্ন করেছেন, "উক্ত দিনগুলোতে আমরা নামাজ কত ওয়াক্ত পড়ব আর তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন, সময় হিসাব করে নামাজ আদায় করবে" - এ বিষয়টিও প্রমাণ করে যে, এখানে প্রকৃত দীর্ঘতা- ই বোঝানো হয়েছে।

'দাজ্জাল তার ডানে ও বামে অনাচার ও বিপর্যয় ছড়াতে থাকবে' - একথার অর্থ হল, সে যেখানেই যাবে, সেখানেই অনাচার ও বিপর্যয় তৈরি হবে। তার ডানে বাঁয়ে তার এজেন্টরা বিপর্যয় তৈরি করতে থাকবে। যেমনটি আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে, প্রধান সেনাপতি বিশেষ বিশেষ জায়গায় যান। অবশিষ্ট জায়গাগুলোতে তার অধীনদের পাঠিয়ে দেন। এই দাবীর পক্ষে সেই বর্ণনাগুলো প্রমাণ বহন করছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে, দাজ্জাল যখন এক যুবক সম্পর্কে সংবাদ পাবে, সে তাকে মন্দ বলছে, তখন সে তার লোকদেরকে বার্তা পাঠাবে, অমুক যুবককে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসো। নুআঈম ইবনে হাম্মাদ 'আলফিতানে' এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, দাজ্জাল ছাড়াও তার লোকেরা মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবে আর দাজ্জাল স্থানে স্থানে গিয়ে তাদের দেখভাল করবে।

দাজ্জালের ফেতনা অনেক বিস্তৃত হবে

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগনের মজলিসে যখনই দাজ্জালের আলোচনা করতেন, তখনই তাঁদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে যেত এবং কান্না শুরু করতেন। কিন্তু এর কারণ কি যে, আজ মুসলমানরা এই ব্যাপারে কোনোই চিন্তা করছে না?

সম্ভবত তার কারণ হল, আজ মানুষ এই ফেতনাটিকে সেই অর্থে বুঝবার চেষ্টা করছে না, যে অর্থে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন। আজ যদি কোন মুসলমান এই হাদিসটি শোনে, দাজ্জালের কাছে খাদ্যের পাহাড় ও পানির নহর থাকবে, তখন সে হাদিসটি এমন অবস্থায় শোনে যে, তাঁর পেট পরিপূর্ণ থাকে এবং পানির কোন অভাবই থাকে না। ফলে সে দাজ্জালের সময়কার পরিস্থিতিকেও নিজের ভরা পেট ও ভেজা গলার সময়কার অবস্থারই উপর অনুমান করে। এই হাদিসগুলো শোনার সময় তাঁর চোখের সামনে এ দৃশ্যটি মোটেও ভাসে না যে, তখনকার পরিস্থিতি এমন হবে যে, দিনের পর দিন নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাবে, রুটির একটুকরোও জুটবে না। অনাহার মানুষকে কাহিল করে তুলবে। পানির অভাবে কণ্ঠনালীতে কাঁটা বিঁধবে।

আপনি বাইরে থেকে ফিরে যখন ঘরে পা রাখবেন, তখন দেখতে পাবেন, আপনার কলিজার টুকরো যে সন্তানটির একটি মাত্র ইশারাতে তাঁর প্রতিটি বাসনা ও দাবি পূরণ হয়ে যেত, আজ তীব্র পিপাসায় তাঁর জীবনটা বের হয়ে গেছে। কয়েক দিনের অনাহার তাঁর গোলাপের মতো সুন্দর মুখ থেকে জীবনের সব সৌন্দর্য- ঔজ্জ্বল্য ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দৃশ্যটি দেখামাত্র আপনার অন্তর খাঁ খাঁ করে উঠল। কিন্তু আপনি অসহায়, অক্ষম। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সন্তানের দিক থেকে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সেদিকে তাকালেন, অদিকে পড়ে আছে আক্ষেপ আর যন্ত্রণার আরেকখানি প্রতিচ্ছবি - মা - আম্মাজান, হ্যাঁ, আপনার আম্মাজান! সেই মা, যিনি আপনাকে ক্ষুধার্ত পেটে কখনও ঘুমতে দেননি। যিনি আপনার ইঙ্গিতেই আপনার পিপাসার কথা বুঝে ফেলতেন। যিনি নিজের সমস্ত সবাদ- আহ্লাদকে আপনার জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন।

আজ আপনার সেই মা চোখের দৃষ্টিতে হাজারো প্রশ্ন ভরে নিয়ে যুবক পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন এই আশায় যে, বাছা আমার আজ একটুকরো রুটি আর এক কাতরা পানি কোথাও থেকে সংগ্রহ করে এনেছে। কিন্তু পুত্রের মুখের লেখা পড়তে সক্ষম মা আপনার মুখাবয়বে লেখা জবাবটা পড়ে নিলেন। পুত্রের অসহায়ত্বের ফলে মায়ের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আপনার কলিজাটা মুখে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হল। আপনি ভেতরে ভেতরেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে লাগবেন।

কষ্টটা সহ্য করতে না পেরে এবার আপনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এই আশায় যে, সম্ভবত ওদিকে কেউ নাই। কিন্তু না, আছে। ওখানে একজন পড়ে আছে - আপনার জীবন সফরের সঙ্গিনী, পরীক্ষার প্রতিটি মুহূর্তে যে আপনাকে সাহস জুগিয়েছেন। কিন্তু আজ ঠোঁট দুটো তাঁর শুকনো। আর দেখতে না দেখতেই প্রেম আপনার অশ্রুতাপে গলে যেতে শুরু করল। অবশেষে আপনিও তো মানুষ। আপনার বুকেও তো গোশত পিণ্ডই ধুকধুক করে। সন্তানের স্নেহ, মায়ের মমতা ও স্ত্রীর প্রেম সবাই মিলে আপনার হৃদয়টাকে তামার মতো গলিয়ে দিল। কোথাও কোন আশ্রয় নেই, কোথাও কোন সহায় সহযোগিতা নেই। কেউ নেই আপনার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবার। কি ভাবে থাকবে, প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি দরজায় এই একই দৃশ্য।

কেউ নেই সাহায্য করবার - সকলেরই সাহায্য দরকার!

এমন সময় বাইরে থেকে সুস্বাদু খাবারের সুঘ্রাণ আর পানির কলকল শব্দ কানে ভেসে এল। আপনি ও আপনার পরিজন সবাই দৌড়ে বাইরে গেলেন। মনে হল, কষ্টের দিন বুঝি শেষ হয়ে গেছে। মানুষের এই বনে কোন 'মাসিহা' এসে পড়েছেন। আগত 'মাসিহা' ঘোষণা করছে, 'ক্ষুধা পিপাসায় কাতর লোকেরা! এই সুঘ্রাণযুক্ত সুস্বাদু খাবার, এই ঠাণ্ডা পানি তোমাদেরই জন্য'।

ঘোষণাটি শোনামাত্র আপনার, আপনার পরিজন ও নগরীর অন্যান্য বাসিন্দাদের আধা জীবন যেন এমনিতেই ফিরে এসেছে। মাসিহা আবার বলতে শুরু করল, এই সবকিছুই তোমাদেরই জন্য। কিন্তু তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, এই খাবার পানির মালিক আমি? তোমরা কি এই বাস্তবতাকে স্বীকার করছ যে, এ সব বস্তু সামগ্রী আমার অধীনে?

এই দ্বিতীয় ঘোষণাটি শোনার পর খাবার পানির প্রতি অগ্রসরমান আপনার পা কিছুক্ষনের জন্য থমকে গেল। আপনি কিছু ভাবতে শুরু করলেন। আপনার স্মৃতি বলল, এই শব্দগুলো তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনার মনে পড়ে গেল, এই মাসিহাটা কে? কিন্তু সেই মুহূর্তে পেছন থেকে আপনার সন্তানের কান্না তীব্র হতে লাগল। মায়ের আর্তনাদ কানে এসে বাজল। স্ত্রীর করুণ আহাজারি কানে এসে ঢুকল। আপনি ছুটে গেলেন। আপনার কলিজার টুকরা – আপনার সন্তানটি মৃত্যু ও জীবনের মাঝে ঝুলছে। যদি কয়েক ফোঁটা পানি জুটে যায়, তাহলে শিশুটির জীবন বেঁচে যেতে পারে।

এখন একদিকে আপনার সন্তান, মা ও স্ত্রীর ভালবাসা, অপরদিকে ঈমান বিধ্বংসী একটি প্রশ্নের উত্তর।

একদিকে আনন্দপূর্ণ ঘর, অন্যদিকে বিলাপের আসর।

যেন একদিকে আগুন, অন্যদিকে মন মাতানো ফুল বাগান।

বলুন, বিবেকের বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিয়ে ভাবুন, বিষয়টি কি এতই সহজ, যতটা আপনি মনে করছেন? নিশ্চয়ই না। বরং তখনকার পরিস্থিতি হবে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনা!

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আদমের সৃষ্টি থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে আল্লাহর নিকট দাজ্জাল অপেক্ষা বড় ফেতনা দ্বিতীয়টি নেই'। (মুসতাদরাকে হাকেম , খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

আরেক বর্ণনায় আছে, "আদম সৃষ্টি থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে দাজ্জাল অপেক্ষা জঘন্য সৃষ্টি দ্বিতীয়টি আর নেই"। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৬৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাজে তাশাহহুদ পাঠ করবে, তখন সে যেন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলবে, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা ও দাজ্জালের ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১২)

দেখুন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করার জন্য কত চিন্তা করতেন যে, আমাদেরকে নামাজের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন।

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "দাজ্জাল যখন বের হবে, তখন তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু মানুষ যাকে আগুন বলে দেখবে, সেটিই হবে

শীতল পানি। আর যাকে পানি বলে দেখবে, সেটিই হবে শীতল পানি। আর যদি দাজ্জালকে পায়, সে যেন সেই বস্তুটিতে অবতরণ করে, যাকে সে আগুন বলে দেখবে। কেননা, সেটিই হল সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি”। (সহিহ বুখারি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৭২)

অপর এক হাদিসে দাজ্জালের সঙ্গে গোশত ও রুটির পাহাড় থাকবে বলে উল্লেখ রয়েছে। তার অর্থ হল, যে লোক তার সম্মুখে মাথানত করবে, তার কাছে সম্পদ ও খাদ্যপন্যের সমারোহ থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাকে অমান্য করবে, তার উপর সব ধরনের অবরোধ আরোপ করে তার জীবনকে কোণঠাসা ও সংকটাপন্ন করে ফেলবে।

দাজ্জালের সামনে সন্তান হল পরীক্ষা

হযরত ইমরান ইবনে হুদাইর (রহঃ) আবু মুজলিজ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবু মুজলিজ (রহঃ) বলেছেন, যখন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তখন মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। একটি দল যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে। একদল মানুষ তার সাথে যোগ দেবে। যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত তার সাথে পাহাড়ের চূড়ায় তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হবে। যে সব নামাজী দাজ্জালের সহযোগীতে পরিণত হবে, তাদের অধিকাংশ সন্তান- সন্ততির জনক জননী হবে। তারা বলবে, আমরা দাজ্জালের গোমরাহি সম্পর্কে ভালভাবেই জানি। কিন্তু এর থেকে আত্মরক্ষা কিংবা এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ঘর বাড়ি পরিত্যক্ত করতে পারি না। তো যারা এই নীতি অবলম্বন করবে, তারাও দাজ্জালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

দাজ্জালের জন্য দুটি ভূমিকে অনুগত বানিয়ে দেওয়া হবে। একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শিকার ভূমি, যাকে সে বলবে, এটি জাহান্নাম। অপরটি সবুজ শ্যামল ভূমি, যাকে সে বলবে, এটি জান্নাত। ঈমানওয়ালাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হবে। অবশেষে এক মুসলমান বলবে, এই পরিস্থিতি আমি সহ্য করতে পারব না। আমি সেই লোকটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, যে মনে করছে, সে আমার রব। যদি প্রকৃতই সে আমার রব হয়, তা হলে আমি তার উপর জয়ী হতে পারব না। তবে এখন আমি যে অবস্থায় আছি, তার থেকে আমি মুক্তি পাব (অর্থাৎ আমি তার কাছে পরাজিত হব, সে আমাকে হত্যা করে ফেলবে, আর আমি যে বিপজ্জনক অবস্থায় নিপাতিত আছি, তার থেকে রেহাই পেয়ে যাব)।

উক্ত মুসলমান তাকে বলবে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর; এতো মস্ত এক বিপদ। এভাবে সে দাজ্জালের সঙ্গে বিদ্রোহের ঘোষণা দেবে এবং তার দিকে এগিয়ে যাবে। লোকটি দাজ্জালকে গভীরভাবে নিরীক্ষা করার পর তার বিরুদ্ধে গোমরাহি, কুফর ও মিথ্যার সাক্ষ্য প্রদান করবে। শুনে দাজ্জাল (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) বলবে, দেখো ব্যাপারটা; যাকে আমি সৃষ্টি করলাম ও পথের দিশা দিলাম, সে কিনা আমাকে মন্দ বলছে! লোক সকল, তোমরা কি মনে করছ, আমি যদি হত্যা করি, পরে আবার জীবিত করি, তাহলে এরপরও তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে কি? জনতা বলবে, না। এবার দাজ্জাল যুবকের গাঁয়ে একটি আঘাত হানবে, যার ফলে তার দেহটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। তারপর আঘাত করবে, এবার সে জীবিত হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানওয়ালার ঈমান আরও বেড়ে যাবে এবং সে দাজ্জালের বিরুদ্ধে কুফর ও মিথ্যার সাক্ষ্য প্রদান করবে। এই যুবক ব্যতীত দাজ্জালের আর কাউকে হত্যা করে জীবিত করার ক্ষমতা থাকবে না। পরে দাজ্জাল বলবে, দেখো, আমি একে হত্যা করে আবার জীবিত করেছি, কিন্তু তারপরও এ আমাকে মন্দ বলছে।

বর্ণনাকারী বলেন, দাজ্জালের কাছে একটি ছুরি থাকবে। সে মুসলমান যুবককে সেটি দ্বারা কাটতে চাইবে। কিন্তু তামা তার ও ছুরির মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। ছুরি মুসলমান যুবকের উপর কোন ক্রিয়াই করবে না। অনন্তর দাজ্জাল যুবককে ধরে তুলবে এবং বলবে, একে আগুনে নিক্ষেপ কর। ফলে তাকে সেই দূর্ভিক্ষকবলিত ভূমিতে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে দাজ্জাল আগুন মনে করবে। অথচ বাস্তবে সেটি হবে জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা। আল্লাহ মুমিন যুবককে জান্নাতে পৌছিয়ে দেবেন। (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১৭৮)

কিছু নামাজী মুসলমানও সন্তান সন্ততির কারণে দাজ্জালের সঙ্গ দিতে বাধ্য হবে। মহান আল্লাহ সন্তানকে পরীক্ষা সাব্যস্ত করেছেন। মূলনীতি হল, পরীক্ষার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। কাজেই যে সব দ্বীনদার লোক ঈমানের অবস্থায় আপন রবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, তাদের উচিত এখন থেকেই এই বিষয়টির অনুশীলন করা যে, আল্লাহর জন্য সন্তানদের পরিত্যাগ করতে পারবে কিনা। এই প্রস্তুতির সহজ পদ্ধতি হল, তারা সেই পথে যেতে প্রস্তুত হয়ে যাক,

যে পথ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হল, ওখানে গেলে আর ফেরত আসা যায় না কিংবা যে ব্যক্তি ওখানে যায়, সে মৃত্যুবরণ করে। নিজেও বারবার এর অনুশীলন করুন এবং স্ত্রী-সন্তানদেরও এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে গোটা পরিবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সাহায্যে দাজ্জালের সময় নিজের দ্বীন ও ঈমান বাচানোর জন্য যে কোন কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

দাজ্জালের কুফরি দেখে বহু মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এক যুবক সে সব সহ্য করতে ব্যর্থ হবে এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। তথাকথিত 'শান্তিকামী সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবী'-রা তাকে বোঝাবেন, তুমি এমনটি কর না; বরং বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সে অনুপাতে কাজ করো। কিন্তু কিছু হৃদয়ের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সঙ্গে জুড়ে যায়, তারা পাগল হয়ে যায় এবং যে কোন তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই তাদের ধর্মে পরিণত হয়ে যায়। এই যুবকও দাজ্জালের কুফরিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে বসবে।

দাজ্জালের দুনিয়াতে অবস্থানকাল ও নিজেকে রব প্রমাণে যুবককে হত্যা ও জীবিত করা

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও নিচু হয়ে যাচ্ছিল, কখনও উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। (তাঁর বক্তব্যের ধারায়) আমাদের মনে ধারনা জন্মাল, দাজ্জাল খেজুর বাগানের মধ্যে আছে। পরে সন্ধ্যায় যখন আমরা তাঁর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাদের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে?

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আপনার স্বর কখনও নিচু হচ্ছিল, কখনও উঁচু হচ্ছিল। ফলে আমাদের মনে ধারনা জন্মাল, দাজ্জাল বোধ হয় খেজুর বাগানে আছে।

উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘সে যদি আমার উপস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তোমাদের পক্ষে আমিই যথেষ্ট হব। আর যদি আমার পরে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে আপন আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের হেফাজতকারী। দাজ্জাল তরতাজা যুবক হবে। তার চোখ বোজা থাকবে। সে আব্দুল ওযযা ইবনে কাতান এর মতো হবে। তোমাদের যেই তাকে পাবে, সেই যেন সূরা কাহফের প্রথম দিককার কটি আয়াত পাঠ করে। ইরাক ও শামের মধ্যখানে যে রাস্তাটি আছে, সে ঐ পথে আত্মপ্রকাশ করবে। সে ডানে বাঁয়ে বিপর্যয় ও অরাজকতা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগন, তোমরা দাজ্জালের মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থেকো’।

আমরা বললাম, ‘ হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়াতে সে কতদিন থাকবে?’

নবীজি (সাঃ) উত্তর করলেন, ‘চল্লিশ দিন। প্রথম একটি দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান হবে। তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতো হবে’।

আমরা বললাম, ‘ হে আল্লাহর রাসুল, তার ভ্রমনের গতি কেমন হবে?’

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘সেই বৃষ্টির মতো, বাতাস যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে একটি সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে তাকে রব মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে। তারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে যা যা বলবে, সব মেনে নেবে। ফলে দাজ্জাল (তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে) আকাশকে আদেশ করবে, ফলে বৃষ্টি হবে। সে মাটিকে আদেশ করবে, ফলে মাটি ফসল উৎপাদন করে দেবে। সন্ধ্যার সময় যখন তাদের পশুপাল ফিরে আসবে, তখন (পেট ভরে খাওয়ার কারণে) তাদের চুলগুলো উত্থিত থাকবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ হবে। তাদের পাগুলো (বেশি খাওয়ার ফলে) ছড়ানো থাকবে। তারপর দাজ্জাল অপর একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকে তাকে রব মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে। কিন্তু তারা তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে, যার ফলে তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে পড়বে এবং ধন সম্পদ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

দাজ্জাল একটি অনুর্বর জমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তাকে আদেশ করবে, তুমি তোমার ধন ভাণ্ডার বের করে দাও। জমি তার ধনভাণ্ডারকে বের করে দিয়ে তার পেছনে এমনভাবে চলতে শুরু করবে, যেমন মৌমাছিরা তাদের নেতার পিছনে চলে থাকে। তারপর সে তাগড়া এক যুবককে ডেকে আনবে এবং তরবারির এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। খণ্ড দুটি এত দূরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, লক্ষ্যে- ছোড়া- তীর যত দূরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এবার দাজ্জাল তাকে

(দুই টুকরো হয়ে যাওয়া যুবককে) ডাক দিবে। সঙ্গে সঙ্গে যুবক উঠে তার কাছে চলে আসবে। এই ধারা চলতে থাকবে। এরই মধ্যে আল্লাহ ঈসা (আঃ) কে পাঠিয়ে দেবেন'। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৫০)

অপর এক বর্ণনায় আছে, "দাজ্জাল উক্ত যুবকের উপর অনেক নির্যাতন চালাবে। তার কোমরে ও পিঠে বেদম প্রহার করবে। তারপর জিজ্ঞেস করবে, এবার বল, আমার উপর ঈমান এনেছ কি? যুবক বলবে, তুমি দাজ্জাল। এবার দাজ্জাল তাকে করাত দ্বারা দুই পায়ের মধ্যখান দিয়ে চিড়ে ফেলতে আদেশ দেবে। তার আদেশ পালিত হবে। যুবককে তার পায়ের মধ্যখান দিয়ে চিড়ে ফেলা হবে। তারপর দাজ্জাল তাকে জোড়া লাগিয়ে জিজ্ঞেস করবে, এবার মানছ কি আমাকে? যুবক বলবে, এখন তো আমি আরও নিশ্চিত হয়েছি যে, তুমি দাজ্জাল। তারপর যুবক জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, লোক সকল, আমার পরে এ আর কারও সাথে এরূপ আচরণ করতে পারবে না"।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তারপর দাজ্জাল যুবককে জবাই করার জন্য পাকড়াও করবে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার গলাটাকে পুরোপুরি তামায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে দাজ্জাল তাকে কাবু করতে পারবে না। এবার দাজ্জাল তার হাত পা ধরে ছুড়ে মারবে। মানুষ মনে করবে, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ দাজ্জাল তাকে যেখানে নিক্ষেপ করেছে, সেটি হল জান্নাত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সমীপে এই যুবকের শাহাদাত শ্রেষ্ঠ শাহাদাত বলে গণ্য হবে"। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৫৬; মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৩৪)

দাজ্জাল হিসাবে ইবনে সায়্যাদকে সন্দেহ

দাজ্জাল সম্পর্কে ইবনে সায়্যাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাটা সঙ্গত বলে মনে করি। ইবনে সায়্যাদ একজন ইহুদি ছিল। লোকটি মদিনায় বাস করত। তার আসল নাম ছিল ‘সাফ’। সে জাদু ও ভেলকিবাজিতে খুব পারদর্শী ছিল। দাজ্জালের মধ্যে যে সব লক্ষন থাকার কথা রয়েছে, তার মধ্যে তার অনেকাংশই পাওয়া যেত। এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ইবনে সায়্যাদের ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন এবং তার পরিচয় জানতে একাধিকবার তার কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি যে, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল কিনা। অনুরূপভাবে শীর্ষস্থানীয় অনেক সাহাবীও ইবনে সায়্যাদকেই দাজ্জাল মনে করতেন। এখানে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একদল সাহাবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ইবনে সায়্যাদ এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে বনু মাগালায় (ইহুদি একটি পল্লীতে) ক্রীড়ারত অবস্থায় পেলেন। বয়সে তরুণ। ইবনে সায়্যাদ তাদের গমনের সংবাদ টের পেল না। এমনকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠে হাত রাখলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?’

প্রশ্নটি শুনে ইবনে সায়্যাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকাল এবং বলল, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি অজ্ঞ লোকদের রাসূল।’ তারপর সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?’

উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধরে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর উপর ও তার রাসুলগনের উপর ঈমান এনেছি। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো তুমি কি দেখছো? অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তুসমূহের মধ্যে তুমি কি কি দেখতে পাও? সে বলল, কখনও তো আমার কাছে সঠিক সংবাদ আসে, আবার কখনও মিথ্যা আসে।

একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পুরো বিষয়টিই এলোমেলো হয়ে গেছে। তারপর বললেন, আমি তোমার জন্য হৃদয়ে একটি কথা লিকিয়ে রেখেছি।

সে বলল, সেই গোপন বিষয়টি হল ধোঁয়া।

একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দূর হও, তুমি তোমার সময় হতে একটুও অগ্রসর হতে পারবে না।

এই পরিস্থিতিতে হযরত ওমর (রাঃ) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অনুমতি দিন, আমি ওর ঘাড়টা উড়িয়ে দেই।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইবনে সায়্যাদ যদি সেই দাজ্জাল হয়, তা হলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, আর যদি সে না হয়, তাহলে একে হত্যা করে কোন লাভ নেই।

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের সেই গাছগুলোর কাছে গমন করলেন, যেখানে ইবনে সায়্যাদ অবস্থান করছিল। তখন উবাই ইবনে কাব আনসারী (রাঃ) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওখানে পৌঁছে কতগুলো খেজুর ডালের পিছনে লুকোতে শুরু করলেন, যাতে ইবনে সায়্যাদ টের পাওয়ার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনে নিতে পারেন। ইবনে সায়্যাদ তার গাঁয়ে চাদর মুড়িয়ে শুয়ে ছিল এবং ভিতর থেকে গুনগুনানির শব্দ আসছিল। এই সময় ইবনে সায়্যাদের মা খেজুর ডালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নবীজিকে দেখে ফেলল এবং বলে উঠল, হে ছাফ, এই যে মোহাম্মদ এসেছে। এটা শুনে ইবনে সায়্যাদ গুনগুনানি বন্ধ করে দিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওর মা যদি ওকে সতর্ক না করত, তা হলে আজ সে তার আসল রূপ প্রকাশ করে দিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই ঘটনার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতে জনতার সামনে দাড়ালেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। তারপর দাজ্জালের আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। নূহ এর পরে এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি, যারা দাজ্জাল সম্পর্কে আপন জাতিকে সতর্ক করেননি। নূহও তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই, যা ইতিপূর্বে কোন নবী বলেননি। তোমরা জেনে রাখো, দাজ্জাল হবে কানা আর নিশ্চিত জানো, আল্লাহ কানা নন'। (সহিহ বুখারি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১১২; সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৪৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাস্তায় ইবনে সায়্যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে সময় তার চোখ ফোলা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার চোখে এই ফোলা কবে থেকে? সে বলল, আমার জানা নেই। আমি বললাম, চোখ হল তোমার মাথায় আর তুমি জান না? সে বলল, আল্লাহ চাইলে এই চোখটি তোমার লাঠিতে সৃষ্টি করে দিতে পারেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই কথোপকথনের পর ইবনে সায়্যাদ তার নাক থেকে সজোরে এমন একটি শব্দ বের করল, যা গাধার শব্দের মতো ছিল'। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৮)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির তাবেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) কে দেখেছি যে, তিনি কসম খেয়ে বলতেন, ইবনে সায়্যাদ দাজ্জাল। আর নবীজি তা অস্বীকার করেননি। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৯২২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯২৯)

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল। ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী মাজাহিবে হক জাদীদ- এর সূত্রে 'কিতাবুল বাছি ওয়ান নুশূর' এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দাজ্জালের পিতামাতা ত্রিশ বছর যাবত এমন অবস্থায় অতিবাহিত করবে যে, তাদের কোন সন্তান জন্মাবে না। ত্রিশ বছর পর তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, যার বড় বড় দাঁত থাকবে। সে অল্প উপকারী হবে। তার চোখ দুটো ঘুমবে বটে; কিন্তু অন্তর ঘুমবে না।

এটুকু বলার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে তার পিতামাতার অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, তার পিতা অস্বাভাবিক দীর্ঘাকায় হবে এবং শরীরে গোশত কম হবে। তার নাক মোরগের চঞ্চুর মতো (লম্বা ও সরু) হবে। তার মা হবে মোটা, চওড়া ও দীর্ঘ হাতের অধিকারী।

আবু বাকারাহ (রাঃ) বলেন, আমরা মদিনার ইহুদীদের মাঝে একটি (বিরল ও বিস্ময়কর) ছেলের উপস্থিতির কথা শুনলাম। তখন আমি ও জুবাইর ইবনে আওয়াম তাকে দেখতে গেলাম। আমরা ছেলেটির পিতামাতার কাছে পৌঁছে দেখলাম, তারা হুবহু তেমন, যেমনটি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কোন পুত্র সন্তান আছে কি? তারা বলল, আমরা ত্রিশটি বছর এভাবে অতিবাহিত করলাম যে, আমাদের কোন পুত্রসন্তান জন্মায়নি? পরে আমাদের ঘরে একটি কানা পুত্র সন্তান জন্মাল, যার দাঁতগুলো বড় বড় এবং কম হিতকর। তার চোখ দুটো ঘুমায় বটে, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।

আবু বাকারাহ (রাঃ) বলেন, আমরা ওখান থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। এবার হঠাৎ উক্ত ছেলেটির উপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হল। ছেলেটি রোদের মধ্যে গাঁয়ে চাদর জড়িয়ে পড়ে ছিল এবং চাদরের মধ্য থেকে এমন এক গুনগুনানির শব্দ আসছিল, যার কোন মর্ম বোঝা যাচ্ছিল না। আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলতে শুরু করলাম। হঠাৎ ছেলেটি মাথা থেকে চাদর সরিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি বলছ? আমরা বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি কি আমাদের কথা শুনে ফেলেছ? সে বলল, হ্যাঁ, আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২২৪৮)

হযরত আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) বলেন, একবার মক্কার সফরে আমার ও ইবনে সায়্যাদের সাক্ষাত হল। সে আমাকে তার সেই কষ্টের কথা ব্যক্ত করল, যা লোকদের দ্বারা সে পেয়েছিল। বলল, মানুষ আমাকে দাজ্জাল বলে। আবু সাঈদ, তুমি কি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুননি, দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না; অথচ আমার একাধিক সন্তান আছে? নবীজি (সাঃ) কি একথা বলেননি যে, দাজ্জাল কাফের হবে, অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি একথা বলেননি যে, দাজ্জাল মদীনা ও মক্কায় প্রবেশ করবে না, অথচ আমি মদিনা থেকে এসেছি এবং মক্কায় যাচ্ছি?

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, ইবনে সায়্যাদ আমাকে সর্বশেষ কথাটি এই বলেছে যে, মনে রেখো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি দাজ্জালের জন্মের সময় ও স্থান সম্পর্কে জানি। সে কোথায় আছে, তাও আমি বলতে পারি। তার পিতামাতাকেও চিনি।

আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) বলেন, ইবনে সায়্যাদের এসব কথা শুনে আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম। আমি বললাম, তুমি আজীবনের জন্য ধ্বংস হও। সে সময় উপস্থিত লোকদের একজন জিজ্ঞেস করল, তোমার কি এটা পছন্দ হবে যে, তুমিই দাজ্জাল? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, দাজ্জালের যত গুন আছে, যদি তার সবগুলো আমাকে দেওয়া হয়, তাহলে আমি মন্দ ভাবব না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯২৭)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, ইবনে সায়্যাদ হাররার ঘটনার সময় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পরে আর কোন দিন ফিরে আসেনি। (সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯৫)

ইবনে সায়্যাদ কি দাজ্জাল ছিল?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সায়্যাদ সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি। সাহাবা কিরামের মতো পরবর্তী আলেমগনেরও মাঝে এ ব্যাপারে মতভেদ চলতে থাকে। যারা ইবনে সায়্যাদের দাজ্জাল হবার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, তাদের দলিল হল দাজ্জাল হবে কাফের। সে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করবে না এবং তার কোন সন্তান জন্মাবে না। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করেন, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল, তাদের বক্তব্য হল, তার মাঝে সেই সব লক্ষন বিদ্যমান ছিল, যেগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তার পিতামাতাও ঠিক তেমনই ছিল, যেমনটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন। তাছাড়া ইবনে সায়্যাদ- এর উক্তি 'আমি দাজ্জালের জন্মের সময় ও স্থান সম্পর্কে জানি' এটিও তার নিজের দাজ্জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

এই পক্ষটি ইবনে সায়্যাদের দাজ্জাল না হওয়ার পক্ষের আলেমগনের দলিলের জবাবে বলেছেন, দাজ্জাল কাফের হবে এ কথা ঠিক। ইবনে সায়্যাদও কাফের ছিল। আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) এর সফরসঙ্গীদের একজন যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তুমি দাজ্জাল? সে উত্তর দিয়েছিল, দাজ্জালকে যেসব বিষয় দেওয়া হয়েছে, যদি আমাকেও সে সব দেওয়া হয়, তাহলে আমি দাজ্জাল হওয়া অপছন্দ করব না। তার এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দাজ্জাল তখনই ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

অবশিষ্ট থাকল, অবশিষ্ট থাকল, মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করা- না- করার বিষয়টি।

এপ্রসঙ্গে মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববি বলেছেন,

'তার ইসলাম প্রকাশ করা, হজ্ব করা, জিহাদ করা ও দুঃসময় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা এসব ক্ষেত্রে তো একথা স্পষ্ট বলা হয়নি যে, সে দাজ্জাল ব্যতীত অন্য কেউ'।

শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগনের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবু জর গিফারি (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও আরও একাধিক বিশিষ্ট সাহাবা ইবনে সায়্যাদ এর দাজ্জাল হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন।

ইমাম বুখারি (রহঃ)ও ইবনে সায়্যাদ এর দাজ্জাল হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত জাবির (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি সেটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তামীমদারি সম্পর্কিত হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) এর হাদিসটি তিনি উল্লেখই করেননি। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩২৮)

যে সব আলেম ইবনে সায়্যাদকে দাজ্জাল মানেন না, তাদের দলিল হল হযরত তামীমদারি শীর্ষক হাদিস। হাফিজ ইবনে হাজর ফাতহুল বারীতে এসব আলোচনার পর বলেছেন, তামীমদারি শীর্ষক হাদিস ও ইবনে সায়্যাদ- এর দাজ্জাল হওয়া বিষয়ক হাদিসগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, তামীমদারি (রাঃ) যাকে বাঁধা অবস্থায় দেখেছিলেন, সে দাজ্জালই ছিল। আর ইবনে সায়্যাদ ছিল শয়তান, যে পুরো সময়টিতে দাজ্জালের রূপ ধারণ করে ইস্ফাহান চলে যাওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ওখানে গিয়ে সে তার বন্ধুদেরসহ সেই সময়ের জন্য গা ঢাকা দিয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে আত্মপ্রকাশের শক্তি দান করবেন। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩২৮)

তাছাড়া ইবনে হাজর দলিল হিসাবে সেই বর্ণনাটিও উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা যখন ইস্ফাহান জয় করলাম, তখন আমাদের বাহিনী ও ইহুদিয়া নামক পল্লীর মধ্যখানে এক ক্রোশ পথের ব্যবধান ছিল। আমরা ইহুদিয়া যেতাম এবং সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি ক্রয় করে আনতাম।

'একদিন আমি ওখানে গেলাম। দেখলাম, ইহুদীরা নাচছে ও বাজনা বাজাচ্ছে। উক্ত ইহুদীদের মাঝে আমার এক বন্ধু ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা নাচ গান করছে কেন? সে বলল, আমাদের যে সম্রাটের মাধ্যমে আমরা আরব বিশ্বকে জয় করব, তিনি আগমন করছেন।

তার এই উত্তরে আমার মনে কৌতূহল জেগে গেল। রাতটা আমি তারই কাছে একটি উঁচু স্থানে অতিবাহিত করলাম। পরদিন সকালে যখন সূর্য উদিত হল, তখন আমাদের বাহিনীর দিক থেকে ধূলি উত্থিত হল। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার গায়ে রায়হানের কাবা জড়ানো আর ইহুদীরা নাচগানে লিপ্ত। আমি লোকটিকে ভালোমতো দেখলাম। বুঝে ফেললাম, লোকটি ইবনে সায়্যাদ। পরক্ষনে সে ইহুদিয়া পল্লীতে ঢুকে গেল এবং পরে এ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি'। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

আলোচনাটি এখানেই শেষ করছি। যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি, তাই বলতে হচ্ছে, প্রকৃত সত্য আল্লাহই জানেন।

এভাবে রহস্য লুকায়িত রাখার মধ্যে মহান আল্লাহর অনেক তাৎপর্য থাকে, যা সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে।

দাজ্জালের আগে পৃথিবীর অবস্থা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“দাজ্জালের আবির্ভাবের আগের কয়েকটি বছর হবে প্রতারণার বছর। এসময়টিতে সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আর মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী আখ্যায়িত করা হবে। দুর্নীতিবাজকে আমানতদার আর আমানতদারকে দুর্নীতিবাজ মনে করা হবে। আর মানুষের মধ্যে থেকে ‘রুয়াইবিজা’রা কথা বলবে”। জিজ্ঞাসা করা হল, ‘রুয়াইবিজা’ কি জিনিস? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “অপরাধপ্রবণ লোকেরা জনসাধারণের বিষয়-আশয় নিয়ে কথা বলবে।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৩৩২; মুসনাদে আবী ইয়া’লা, হাদিস নং ৩৭১৫, আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

হাদিসটি বর্তমান যুগের জন্য কতখানি উপযোগী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাকথিত ‘সভ্যজগত’ এর বিবৃত মিথ্যাকে কত ‘শিক্ষিত’ মানুষও সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সেই মিথ্যার ফিরিস্তি এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, যদি তা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে লিপিবদ্ধকারীর জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু মিথ্যার তালিকা শেষ হবে না। আর কত সত্য এমন আছে, যার গায়ে ‘ন্যায়প্রিয়’ পশ্চিমা মিডিয়া ও তাদের তল্পিবাহক অন্যান্য মিডিয়া তাদের প্রতারণার এমন কলঙ্ক লেপে দিয়েছে যে, জীবন ক্ষয় করে পরিষ্কার করলেও বিমোচিত হবে না।

এই হাদিসে একটি আরবি শব্দ আছে ‘খাদাআ’। শব্দটির একটি অর্থ বৃষ্টি বেশি হওয়া। ইবনে মাজার ব্যাখ্যায় এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ‘এই বছরগুলোতে বৃষ্টি বেশি হবে, কিন্তু ফসলের উৎপাদন কম হবে। এই বছরগুলোর জন্য এটি হল একটি ধোঁকা’।

উমাইর ইবনে হানী থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“একটি সময় আসবে, যখন মানুষ দুটি তাঁবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি তাবু হবে ঈমানের, যেখানে কোন নিফাক (কপটতা/দ্বিমুখীতা) থাকবে না। অপর তাঁবুটি হবে নিফাকের, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। যখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, তখন সেদিন থেকে বা তার পরদিন থেকে দাজ্জালের অপেক্ষা করো”। (সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৪; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১৩)

আল্লাহপাকের হেকমত অনেক সূক্ষ্ম। তিনি যাকে দ্বারা ইচ্ছা হয় কাজ নিয়ে নেন। মুসলমানরা নিজেরা তো এই উভয় (মুমিনওয়ালা ও মুনাফিকওয়ালা) তাঁবু তৈরি করে নিতে পারে না। তাই আল্লাহ পশ্চিমা এক নেতার মাধ্যমে কাজটির শুভ সূচনা করিয়ে নিয়েছেন। আফগানিস্তানের মতো একটি দরিদ্র দেশকে ৯/১১ এর জন্য দায়ী করে কোন তথ্য প্রমাণের ধার না ধরে আক্রমণ করার সময় ইহুদি মতাদর্শের সেবক সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেছিল, “হয় আপনি আমাদের সাথে আর নয় তো আপনি ‘সন্ত্রাসী’ দের সাথে”।

বিপুল সংখ্যক মানুষ এই তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। আল্লাহ এই কাজটিও পরিপূর্ণ করে দেবেন এবং অবশ্যই করবেন। তাতে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে, কে ঈমানওয়ালা আর কার অন্তরে ঈমানওয়ালাদের তুলনায় আল্লাহর শত্রুদের প্রতি বেশি ভালোবাসা লুকিয়ে রয়েছে। তাই প্রত্যেককে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার যে, আমি কোন তাঁবুতে আছি কিংবা আমার সফর কোন তাঁবুর দিকে। নীরব দর্শনার্থীদের না ইবলিস ও তার দলভুক্তদের

প্রয়োজন আছে, না আল্লাহর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে। এই যুদ্ধ সিদ্ধান্তমূলক লড়াই। কাজেই প্রত্যেককে কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে।

এটি এমন একটি সময়, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিটি সংগঠন, প্রতিটি দল সেদিকে ঝুঁকে যাবে, যার সঙ্গে তার হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেনঃ

“যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি ভেবে বসেছে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না?” (সূরা মুহাম্মাদঃ ২৯)

প্রতিটি দেশ ইহুদীদের দ্বারা পরিচালিত ইহুদী স্বার্থের অনুকূলে একাট্টা হয়ে যাবে এবং বহু সংগঠন একটি অপরটির সাথে মিশে যাবে। যেসব সংগঠনের ‘ব্যাক ডোর’ ইহুদীদের হাতে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইহুদী মিশন বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং ইহুদী মতাদর্শের সেবক নেতাদের মুখ থেকে যে আওয়াজ উত্থিত হবে, উক্ত সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকেও একই ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

বিশেষ করে, বর্তমানে আল্লাহ প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডে বিভিন্ন নামে ঈমান, আকিদা ও ইসলামী শরীয়তের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এমন সব ইস্যু নিয়ে আসছেন, যে প্রতিটি মুসলিমধারী পুরুষ এবং মহিলা বাধ্য হচ্ছেন ব্যক্তি পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঈমান ও নিফাকের আদলে পৃথক হতে। আর কাফের মুশরিকরাও সেই সব ইস্যুতে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে জোর গলায়। ফলে ঈমানওয়ালা আর মুনাফিকদের পরিচয় হয়ে উঠছে প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

“একদিন আমি হুজায়ফা’র সঙ্গে হাতিমে ছিলাম। সে সময় তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। পরে বললেন, ইসলামের আংটাগুলো একটি একটি করে ভেঙ্গে যাবে আর বহু বিভ্রান্তকারী নেতার আবির্ভাব ঘটবে। তার পরপরই তিনজন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। আমি বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ, এই কথাগুলো আপনি আল্লাহর রাসুল থেকে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এই কথাগুলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনেছি। আর আমি তাকে একথাও বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল ইস্পাহানের ইহুদিয়া নামক অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে”। (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

এই বর্ণনাটি অনেক দীর্ঘ, যার অংশ বিশেষ এই - “তিনটি আর্তনাদ উত্থিত হবে, যা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের সবাই শুনতে পারে.....। হে আব্দুল্লাহ, যখন তুমি দাজ্জালের সংবাদ শুনবে, তখন পালিয়ে যেয়ো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হুজায়ফাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যাদেরকে পিছনে রেখে যাব, তাদের হেফাজত কিভাবে করব? হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বললেন, তাদেরকে আদেশ করে যাবেন, যেন তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তারা যদি সবকিছু ত্যাগ করে যেতে না পারে? তখন হুজায়ফা (রাঃ) বললেন, তাদেরকে আদেশ করে যাবেন, যেন তারা সবসময় ঘরেই থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, যদি তারা এ-ও করতে না পারে, তাহলে? হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বললেন, হে ইবনে ওমর! সময়টি হবে আতঙ্ক, ফেতনা, অনাচার ও লুটপাটের। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে হুজায়ফা, সেই দুর্যোগ থেকে কোন মুক্তি আছে কি? হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বললেন, কেন থাকবে না? এমন কোন ফেতনা নেই, যার থেকে মুক্তি নেই”।

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত : আমি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, "আমি আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের থেকে কিছু একটা ব্যাপার ভয় করি।" এটা শুনে আমি ভয় পেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেটা কি?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "পথভ্রষ্ট এবং ধ্বংসযোগ্য আলেমরা" [মুসনাদে আহমাদ (৫/১৪৫), হাদিস নং ২১৩৩৪ এবং ২১৩৩৫]

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি যে বিষয়টিকে বেশি ভয় করি, তা হল, বিভ্রান্তকারী নেতৃবর্গ।"

দাজ্জালের সময় এই চরিত্রের নেতাদের ছড়াছড়ি থাকবে। দাজ্জালি শক্তির চাপ কিংবা প্রলোভনে এসে তারা নিজেরাও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অনুগত অনুসারীদেরও সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণ হবে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমার ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। সে সময় তিনি দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন,

"তার আগে তিনটি বছর অতিবাহিত হবে। প্রথম বছরটিতে আকাশ একতৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখবে আর মাটি একতৃতীয়াংশ ফসল ধরে রাখবে। দ্বিতীয় বছর আকাশ দুইতৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখবে আর মাটি দুইতৃতীয়াংশ ফসল ধরে রাখবে। তৃতীয় বছর আকাশ পূর্ণ বৃষ্টি আটকে রাখবে আর মাটি পূর্ণ ফসল ধরে রাখবে। ফলে সব ধরনের গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে যাবে"। (আল মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ৪০৬; মুসনাদে আহমাদ)

অপর এক বর্ণনায় আছেঃ

"তুমি আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে দেখবে; অথচ সে বৃষ্টি বর্ষণ করবে না। তুমি জমিনকে ফসল উৎপন্ন করতে দেখবে; অথচ জমি ফসল উৎপন্ন করবে না"। (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৯)

এর অর্থ এও হতে পারে যে, বৃষ্টিও বর্ষিত হবে, ফসলও উৎপন্ন হবে। কিন্তু তথাপি মানুষের কোন উপকার হবে না এবং মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে যাবে।

দাজ্জাল কখন আত্মপ্রকাশ করবে?

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বাইতুল মাকদিসের আবাদ হওয়া মদিনার ক্ষতির কারণ হবে। মদিনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কুস্তুন্তুনিয়ার (ইস্তাম্বুলের) বিজয়ের কারণ হবে। কুস্তুন্তুনিয়ার বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসের বর্ণনাকারীর (অর্থাৎ - স্বয়ং তাঁর) উরুতে কিংবা কাঁধের উপর চাপড় মেরে বললেন, "তোমার এই মুহূর্তে এখানে উপবিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই বিবরণও তেমনই বাস্তব।" (সুনানে আবী দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১০; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৪৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

'বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদ হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য ওখানে ইহুদীদের শক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া। সেই ঘটনাটি ঘটে গেছে। এখন ইহুদীদের নাপাক দৃষ্টি পবিত্র মদিনার উপর নিবদ্ধ। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাদের আরব দ্বীপে আগমন প্রকৃতপক্ষে সেই পরিকল্পনারই একটি অংশ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারগণ ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র বঝে ফেলেছে। এভাবে তখন থেকে শুরু হওয়া কুফর ও ইসলামের লড়াই এখন দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"মহাযুদ্ধ ও কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) জয়ের মধ্যখানে সময় যাবে ছয় বছর। সপ্তম বছরে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে।" (ইবনে মাজা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৭)

মহাযুদ্ধ ও কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) জয় সম্পর্কে দুটি বর্ণনা এসেছে। এক বর্ণনায় ছয় মাসের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। অপর বর্ণনায় ছয় বছর। তবে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি ফাতহুল বারীতে মন্তব্য করেছেন, সনদের দিক থেকে ছয় বছর বিষয়ক বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৭৮)

তাছাড়া আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আওনুল মা'বুদে মোল্লা আলী কারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, 'মহাযুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান বিষয়ে সাত মাস সংক্রান্ত বর্ণনার তুলনায় সাত বছরবিষয়ক বর্ণনা অধিক বিশুদ্ধ।' অর্থাৎ মহাযুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ছয় বছর। সপ্তম বছরে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। (আওনুল মা'বুদ, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২৭২)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কি এমন কোন নগরীর নাম শুনেছ, যার একদিকে বন আর অন্যদিকে নদী?" সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি, হে আল্লাহর রাসুল। আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইসহাক বংশের সত্তর হাজার সেনা উক্ত নগরীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তারা এই নগরীতে এসে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু তারা কোন অস্ত্র দ্বারাও যুদ্ধ করবে না এবং একটি তীরও ছুড়বে না। তারা বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' আর অমনি নগরীর দুই দিককার প্রাচীরের একদিক ভেঙ্গে পড়বে। তারপর তারা দ্বিতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলবে আর অমনি অপর দিককার প্রাচীরও খসে পড়বে। তারপর তারা তৃতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলবে আর অমনি তাদের জন্য প্রশস্ত পথ তৈরি হয়ে যাবে। তারা সেই পথে নগরীতে প্রবেশ করবে। তারা মালে গনিমত

অর্জন করবে। এই মালে গনিমত বণ্টনে তারা আত্মনিয়োগ করবে। হঠাৎ একটি আওয়াজ কানে আসবে যে, কেউ একজন ঘোষণা করবে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে তারা সবকিছু ফেলে রেখে (দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে) ফিরে যাবে।" (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৩৮)

এই হাদিসে যে নগরীর কথা বলা হয়েছে, সেটি হল কুস্তুন্তুনিয়া বা ইস্তাম্বুল।

দাজ্জাল সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, সে কোন একটি কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। হতে পারে, যখন মহাযুদ্ধের কারণে কুফরি শক্তির পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এবং পরাজিত কুফরি শক্তিগুলো তার নেতৃত্বে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।

দাজ্জাল কোথা থেকে আত্ম প্রকাশ করবে?

ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি, "ইস্ফাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে। তাদের গায়ে সবুজ বর্ণের চাদর (বা জুব্বা) থাকবে"। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৬৬)

যেমনটি পেছনে বলে এসেছি, ইসরাইলে বিশেষ এক ধরনের পোশাক তৈরির কাজ চলছে, যেগুলো তাদের ধর্মনেতারা দাজ্জালের আবির্ভাবের পর পরিধান করবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করলেন। আমি তখন বসে বসে কাঁদছিলাম। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দাজ্জালের কথা মনে পড়ে গেছে। শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যদি সে আমার জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তোমার পক্ষে আমিই যথেষ্ট হব। আর যদি আমার পরে আত্মপ্রকাশ করে, তবুও তোমার আতঙ্কিত হওয়ার কনো প্রয়োজন নাই। কেননা, তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কানা হবে আর তোমার রব কানা নন। সে ইস্ফাহানের ইহুদিয়া নামক অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে"। (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৭৫)

হযরত আমর ইবনে হুরাইছ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"দাজ্জাল পৃথিবীর এমন একটি অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, যেটি প্রাচ্যে অবস্থিত এবং যাকে খোরাসান বলা হয়। তার সঙ্গে অনেক দল মানুষ থাকবে। তাদের একটি দলের লোকদের চেহারা স্ফীত ঢালের মতো হবে"। (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭; সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৫৩; মুসনাদে আবু ইয়ালা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭)

দাজ্জালের সঙ্গে এমন একদল মানুষ থাকবে, যাদের মুখমণ্ডল এরূপ স্ফীত ঢালের মতো হবে। প্রশ্ন হল, সত্যিই কি তাদের মুখমণ্ডল এরূপ হবে? নাকি তারা কিছু পরিধান করে তাদের মুখমণ্ডল এরূপ বানিয়ে রাখবে? কোনটি সঠিক আল্লাহই তা ভালো জানেন।

এই হাদিসে খোরাসানকে দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান বলা হয়েছে। এর আগের বর্ণনায় বলা হয়েছে ইস্ফাহান। এই দুই বর্ণনায় মূলত কোন বিরোধ নেই। কারণ, ইস্ফাহান ইরানের একটি প্রদেশ আর ইরান একসময় খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খোরাসান সম্পর্কে সেই বাহিনীর বর্ণনাও আছে, যারা ইমাম মাহদির সহায়তার আগমন করবে। কাজেই আমরা যদি মাহদি বাহিনীর লক্ষনগুলো সমগ্র খোরাসানে অনুসন্ধান করি, তাহলে তা আফগানিস্তানের সেই ভূখণ্ডটিতে পরিদৃষ্ট হবে, যেখানে বর্তমানে পাখতুন বসতি বেশি। তাই লক্ষনদৃষ্টে বলা যায়, হযরত মাহদির সহায়তাকারী বাহিনীটি খোরাসানের সেই অঞ্চল থেকে গমন করবে, যেটি বর্তমানে তালেবান আন্দোলনের ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত।

অপর এক বর্ণনায় দাজ্জালের আবির্ভাবস্থল হিসাবে ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী একটি জায়গার কথা বলা হয়েছে। ফলে এখানে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বিরোধের সমাধান হল, দাজ্জালের আগমন ইস্ফাহান থেকেই ঘটবে। তবে তার প্রচার ও খোদায়ী দাবীর ঘটবে ইরাকে। এই হিসাবেও একে "আবির্ভাব" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এখানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের স্থান ইস্ফাহানের ইহুদিয়া নামক একটি জায়গার কথা বলা হয়েছে। বাখাত নাসার (দ্বিতীয় নেবুকাডন্যাজার) যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন বহু সংখ্যক ইহুদি এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে ইহুদিয়া। ইহুদীদের মাঝে ইস্ফাহানের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এক হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের সঙ্গে সত্তুর হাজার ইহুদি থাকবে।

দাজ্জাল বিষয়ে ইরাক সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা

হায়ছাম ইবনে মালেক আত- তায়ী বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাজ্জাল দুই বছর ইরাক শাসন করবে। তাতে তার সুশাসন প্রশংসিত হবে এবং মানুষ তার দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হবে। দুই বছর পর একদিন সে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিবে। তখন জনতাকে উদ্দেশ্য করে সে বলবে, এখনও কি সময় আসেনি, তোমরা তোমাদের প্রভুর পরিচয় লাভ করবে? এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করবে, আমাদের প্রভু কে? দাজ্জাল বলবে, আমি। আল্লাহর এক বান্দা তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল তাকে হত্যা করে ফেলবে"। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৩৯)

ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে- ই দাজ্জালের আবির্ভাবের সংবাদ শুনবে, সে- ই যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর শপথ, এমন ঘটনা ঘটবে যে, কোন লোক এমন অবস্থায় তার কাছে আসবে, সে নিজেকে মুমিন ভাবছে, কিন্তু এসে তার কর্মকাণ্ডে সন্দেহে নিপাতিত হয়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে"। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৭৬২)

দাজ্জালের ফেতনা সম্পদ, সৌন্দর্য ও শক্তি – মোট কথা সব বিষয়ে হবে। আর জগত তার সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে শহরে নগরে অবস্থান করে থাকে। যে অঞ্চল শহর থেকে যত দূরে হবে, সেখানে দাজ্জালের ফেতনা তত কম হবে। উম্মে হারামের হাদিসেও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, মানুষ দাজ্জাল থেকে এত পলায়ন করবে যে, তারা পাহাড়ে চলে যাবে।

দাজ্জালের সাথে হযরত তামীমদারি (রাঃ) এর সাক্ষাত

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একদিন আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনলাম, 'নামাজ প্রস্তুত'। শুনে আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতে নামাজ আদায় করলাম। আমি মহিলাদের সেই সারিটিতে ছিলাম, যেটি পুরুষদের একেবারে পেছনে ছিল।

নামাজ সমাপ্ত করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিটিমিটি হাসতে হাসতে মিম্বরে উঠে বসলেন এবং বললেন, 'প্রত্যেকে নিজ নিজ নামাজের স্থানে বসে থাকো'। তারপর বললেন, 'তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন সমবেত করেছি?'

সাহাবাগন বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান কিংবা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সমবেত করিনি। আমি তোমাদেরকে একটি ঘটনা শোনাবো। তামীমদারি নামে এক খ্রিষ্টান ছিল। সে আমার কাছে এসে মুসলমান হয়ে গেছে। সে আমাকে একটি ঘটনা বলেছে, যেটি আমি দাজ্জাল সম্পর্কে আগে যা বলেছি, তার অনুরূপ।

সে আমাকে বলেছে : আমরা বনু লাখম ও বনু জুজামের ত্রিশজন লোক নিয়ে নৌভ্রমনে বের হয়েছিলাম। সমুদ্রের তরঙ্গ এক মাস যাবত আমাদের নিয়ে দুলতে থাকল। এক পর্যায়ে আমরা একটি দ্বীপে গিয়ে উপনীত হলাম। তখন সময়টা ছিল সন্ধ্যাবেলা। আমরা ছোট ছোট ডিঙ্গিতে করে নেমে দ্বীপের ভেতরে ঢুকে গেলাম। ওখানে আমরা বিস্ময়কর প্রকৃতির একটি প্রাণীর সাক্ষাত পেলাম, যার মাথায় মোটা ও ঘন চুল ছিল। চুলের আধিক্যের কারণে আমরা বুঝতে পারিনি, প্রাণীটি আসলে কি।

আমরা বললাম, তোমার ধ্বংস হোক, কে তুমি?

প্রাণীটি বলল, আমি 'জাসসাসা'।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'জাসসাসা' কি?

সে বলল, তোমরা গির্জায় সেই লোকটির নিকট যাও, যে তোমাদের সংবাদ নিয়ে খুবই বিচলিত।

প্রাণীটি যখন আমাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, ওটা শয়তান কিনা! আমরা তাড়াতাড়ি গির্জায় চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, ভেতরে বৃহদাকৃতির এমন একজন লোক বসে আছে যে, এমন ভয়ানক মানুষ আমরা এর আগে কখনও দেখিনি। লোকটির হাতদুটো কাঁধ পর্যন্ত আর পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত শিকল দ্বারা বাঁধা।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ধ্বংস হোক, কে তুমি?

সে বলল, তোমরা যখন আমাকে পেয়েই গেছ আর আমাকে চিনে ফেলেছ, তা হলে বল, তোমরা কারা?

আমরা বললাম, আমরা আরবের লোক।

সে জিজ্ঞেস করল, বায়সানের খেজুর গাছগুলোতে ফল ধরছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, ধরছে তো।

সে বলল, সেই সময়টি নিকটে, যখন সেগুলোতে ফল ধরবে না। তারপর জিজ্ঞেস করল, তারবিয়া উপসাগরে পানি আছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে।

সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে তার পানি শুকিয়ে যাবে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, জুগার কূপের অবস্থা কি? তাতে পানি আছে কি? তার পার্শ্ববর্তি মানুষ সেই পানি দ্বারা কৃষিকাজ করছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ।

তারপর জিজ্ঞেস করল, নিরক্ষর লোকদের নবী সম্পর্কে বল; তিনি কি করেছেন?

আমরা বললাম, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন।

সে জিজ্ঞেস করল, আরবরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, তিনি আরবদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন?

তামীমদারি জানায়, আমরা তাকে পুরো ঘটনা শোনলাম যে, আরবে যারা সজ্জন ছিল, তিনি তাদের জয় করে নিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে।

শুনে লোকটি বলল, তাঁর আনুগত্য মেনে নেওয়াই ভালো। এবার আমি তোমাদেরকে আমার ইতিবৃত্ত বলছি। আমি মাসিহ (দাজ্জাল)। অচিরেই আমাকে আত্মপ্রকাশের আদেশ দেওয়া হবে। আমি বাইরে বের হব এবং সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করব। এমনকি আমি এমন কোন জনবসতি বাদ রাখব না, যেখানে আমি প্রবেশ করব না। চল্লিশ রাত একটানা ঘুরতে থাকবো। কিন্তু মক্কা ও মদিনায় যাব না। ওখানে যেতে আমাকে বারন করা হয়েছে। আমি যখন তার কোনটিতে ঢুকতে চেষ্টা করব, তখন একজন ফেরেশতা তরবারি হাতে নিয়ে আমাকে প্রতিহত করবে। ওই শহরগুলোর প্রতিটি সড়কে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে।

এই ঘটনা শোনানোর পর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের লাঠি দ্বারা মিম্বরের উপর আঘাত করে বললেন, 'এই হল তায়্যেবা - এই হল তায়্যেবা; মানে মদিনা'। তারপর তিনি বললেন, 'শোন, আমি তোমাদেরকে এই বিষয়টিই বলতাম। মনে রেখো, মনে রেখো, দাজ্জাল শাম কিংবা ইয়েমেনের কোন সাগরে নেই। সে পূর্বের কোন একস্থানে আছে। সে পূর্বের কোন একস্থানে আছে। সে পূর্বের কোন একস্থানে আছে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫২৩৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন, "সে পূর্বের কোন একস্থানে আছে"।

এব্যাপারে আলেমগন বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে অভিহিত করেছিলেন যে, দাজ্জাল প্রাচ্যে আছে। একারণে তিনি পূর্বের তথ্যটি করে নিয়ে পরের তথ্যটি তিনবার উচ্চারন করেছেন। তিনি এপর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখলেন এবং দাজ্জালের অঞ্চল ও অবস্থানকে আর বেশি চিহ্নিত করলেন না। তাই এখানেই আলোচনার ইতি টানা হচ্ছে।

দাজ্জাল মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করবে না

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাজ্জালের প্রভাব মদিনায় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদিনায় সাতটি ফটক থাকবে। প্রতিটি ফটকে দুজন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে"। (সহিহ বুখারি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৫৫)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এমন কোন নগরী নেই যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না - দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা ব্যতীত। মদিনার প্রতিটি প্রবেশ দ্বারে সেদিন দুজন করে ফেরেশতা থাকবে, যারা তার থেকে দাজ্জালের প্রভাবকে প্রতিহত করবে"। (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৮৪)

হযরত মিহজান ইবনে আদরা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি তিনবার বলেছেন,"ইয়াওমুল খালাসি ওয়ামা ইয়াওমুল খালাসি"।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল, 'ইয়াওমুল খালাস' কি জিনিস? "

উত্তরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাজ্জাল আসবে এবং ওহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করবে। তারপর তার সাথীদের বলবে, তোমরা কি ঐ সাদা ভবনটি দেখতে পাচ্ছ? এটি আহমদ- এর মসজিদ। তারপর সে মদিনার দিকে এগিয়ে আসবে। সে তার প্রতিটি পথে খাপখোলা তরবারি হাতে একজন ফেরেশতাকে দণ্ডায়মান দেখতে পাবে। সে জুরফ আল সাখার দিকে যাবে এবং নিজ তাঁবুর গাঁয়ে আঘাত হানবে। তারপর মদিনা তিনটি কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও নারী, ফাসেক পুরুষ ও নারী মদিনা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এটিই হল 'ইয়াওমুল খালাস' বা 'মুক্তির দিন'"। (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৮৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবাদের লক্ষ্য করে তিনবার বললেন, "মুক্তিপ্রাপ্তির দিন। তোমরা কি জান মুক্তিপ্রাপ্তির দিন কোনটি ?" তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), মুক্তিপ্রাপ্তির দিন কোনটি?"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দাজ্জাল জাবাল হাবশির উপড়ে উঠে মদিনার দিকে তাকাবে এবং তার সাথীদের বলবে, ' তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখছ ? ওটা হল আহমদের মসজিদ (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি নাম আহমাদ)।' এরপর দাজ্জাল মদিনাতে পৌঁছে প্রত্যেক পথে খোলা তরবারি হাতে একজন ফেরেশতা দেখতে পাবে। এরপর সে আল জুরফের (জুরফ আল সাখার) পতিত ভূমিতে চলে গিয়ে তাবু গড়বে। মদিনা তখন ৩ বার প্রকম্পিত হবে এবং কোন মুনাফিক নর- নারী, অসৎ নর- নারী বের হয়ে তার সাথে যোগ দিতে ব্যর্থ হবে না। এটিই হল সেই মুক্তিপ্রাপ্তির দিন।"(দুর্বল হাদিস)

জাবাল হাবশি : বামে - সাইড ভিউ, ডানে - স্যাটেলাইট ভিউ
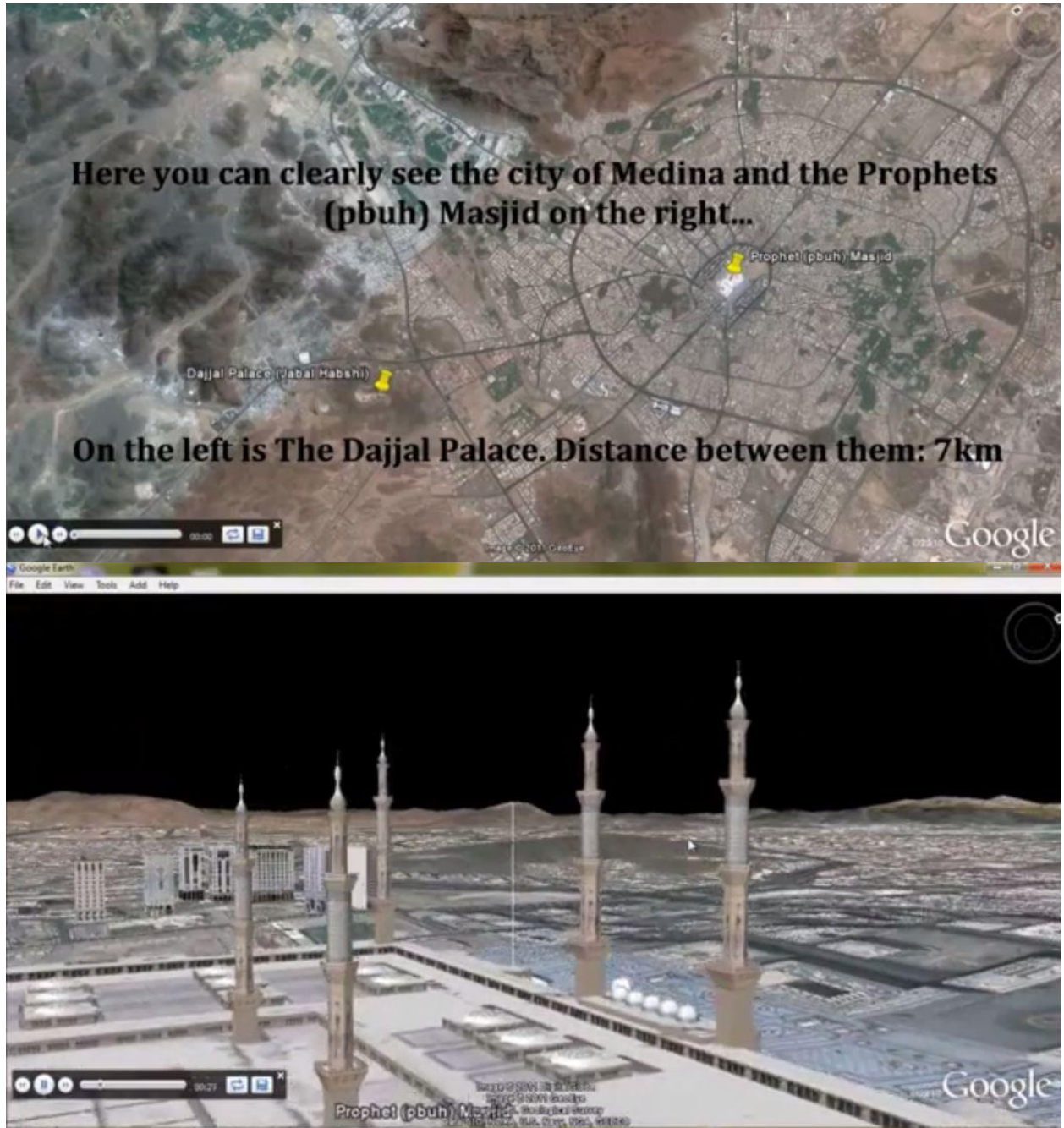
জাবাল হাবশি থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মসজিদে নববি

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সৌদি আরবে জাবাল হাবশি নামে আরও কিছু পাহাড় আছে, তবে বিশেষভাবে এই জাবাল হাবশির উল্লেখ করার কারন স্থানীয় লোকেরা একে “দাজ্জাল প্যালেস” হিসেবে ডেকে থাকে, যেখানে বর্তমানে একটি রাজকীয় প্রাসাদ রয়েছে।

দাজ্জাল মসজিদে নববীকে 'সাদা ভবন' আখ্যা দিবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় একথাটি বলেছিলেন, তখন মসজিদে নববী সম্পূর্ণ সাদা মাটির তৈরি ছিল। আর এখন যদি মসজিদে নববীকে দূর থেকে কিংবা কোন উঁচু জায়গা থেকে দেখা হয়, তাহলে অন্যান্য ইমারতের মাঝে তাকে পুরোপুরি একটি সাদা ভবনের মতোই মনে হয়। স্যাটেলাইটের সাহায্যে মসজিদে নববীর একটি চিত্র ধারণ করা হয়েছিল। তাতে মসজিদকে সাদা- ই দেখা যাচ্ছে।

মসজিদে নববীর স্যাটেলাইট ভিউ যাতে মসজিদে নববীকে সাদা দেখা যাচ্ছে। আরও একটি ব্যাপার, গুগল ম্যাপের স্যাটেলাইট অপশনের মাধ্যমে ক্যাপচার করা এই ছবির বামে উপরের কোনা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন সেই "All Seeing Eye"

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, দাজ্জালের সময় মদিনায় সাতটি ফটক থাকবে। তো সাত ফটক দ্বারা উদ্দেশ্য মদিনায় প্রবেশের সাতটি পথও হতে পারে। বর্তমানে মদিনা প্রবেশের সাতটি বড় রাস্তা বিদ্যমান রয়েছেঃ

১। জেদ্দা থেকে আসা পথ।

২। মক্কা থেকে আসা পথ।

৩। রাবিগ থেকে আসা পথ।

৪। বিমানবন্দর থেকে আসা পথ।

৫। তাবুক থেকে আসা পথ।

এছাড়া আরও দুটি রাস্তা আছে, মফস্বল অঞ্চল থেকে মদিনায় প্রবেশ করা যায়।

মুমিনদের জন্য খুবই চিন্তার বিষয়।

দাজ্জালকে জয়ী করার লক্ষ্যে মাহদি বিরোধী সম্ভাব্য ইবলিসি চক্রান্তসমূহ

এটি ইবলিসের পুরনো রীতি যে, সে সত্যকে সংশয়যুক্ত বানানোর লক্ষ্যে নিজের তৈরি এজেন্টদেরকে সত্যের দাবিসহ মাঠে নামিয়ে দেয় এবং সত্যকে মিথ্যা বানানোর চেষ্টা চালায়। ইবলিসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এই হবে যে, হযরত মাহদির আগমনের পূর্বে সে একাধিক নকল মাহদি দাড় করিয়ে দিবে, যাতে কিছু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সত্য থেকে দূরে সরে যায় এবং যখন আসল মাহদির আগমন ঘটবে, তখন মানুষ আপনা থেকেই সংশয়ের শিকার হয়ে পড়বে যে, কে বলবে, ইনি আসল মাহদি, না ভুয়া মাহদি। 'বিভ্রান্তকারী নেতৃবৃন্দ বিষয়ক' হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এক্ষেত্রে ইবলিসের প্রচেস্টাসমূহ অনেকটা এরকম হতে পারেঃ

১। মিথ্যা মাহদির দাবিদারদেরকে দাড় করাবে। তাদের মাঝে হযরত মাহদির গুণাবলী আছে বলে প্রচার করে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া হবে। এই ভুয়া মাহদির দাবিদার একাধিক হবে। আর একথা বলার অবকাশ থাকে না যে, এই মাহদিদেরকে অপার বিদ্যা, সুদর্শন আকার গঠন ও একদল ভক্ত মুরীদসহ জনসন্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং বড় বড় জুব্বা বা কাবলি ওয়ালা মানুষ এই মিথ্যা মাহদিদেরকে আসল মাহদি বলে প্রমাণিত করতে সচেষ্ট হবে। 'কাদিয়ানী' সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকারী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে প্রথম ইমাম মাহদি, পরে মাসিহ এবং সবশেষে নবীই দাবি করে বসে। আর বর্তমানে এই কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতি পশ্চিমাদের এবং উপমহাদেশে তাদের দালাল মিডিয়ার সমর্থন সম্পর্কে প্রায় সব সচেতন মুসলিমই ওয়াকিবহাল।

যুগে যুগে অসংখ্য ব্যক্তি নিজেকে মাহদী (এবং অনেক সময় একই সাথে নবীও) হিসেবে দাবী করে। এদের মধ্যে অনেকে সাধারন মানুষ, অনেকে প্রভাবশীল নেতা, এমনকি স্কলারও রয়েছে, তবে শিয়াদের মধ্যে নিজেকে মাহদী দাবী করার প্রচুর প্রবণতা দেখা যায়। আমরা অতি সংক্ষেপে ইতিহাস থেকে ঘুরে আসি।

৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে খলীফা হিশাম ইবন আবদুল মালিকের সময়কালে সালিহ ইবন তারিফ নিজেকে নবী এবং মাহদী বলে দাবী করে। সে দাবী করে আল্লাহ্ তার কাছে কিতাব নাযিল করেছে যেখানে ৮০ টি সূরা রয়েছে। এই কিতাবকে কুরআন বলা হতো। তার অনুসারীরা (যাদের সালিহ আল মু'মিনিন বা মুমিনদের পুনরুদ্ধারকারী বলে ডাকা হতো) ইবাদতের সময় এসব সূরা পাঠ করত। সে দাবী করেছিলো যে ঈসা (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাথী হবে এবং তার পিছে সালাত আলায় করবেন। সে আরও দাবী করেছিলো তার পর আর কোন নবী আসবে না। তার তৈরি করা মতবাদের মধ্যে কয়েকটি মতবাদ হল একজন পুরুষ যত সংখ্যক নারীকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে এবং যত ইচ্ছা ডিভোর্স করতে পারবে, রামাদানের পরিবর্তে রজব মাসে সিয়াম পালন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের পরিবর্তে দশ ওয়াক্ত সালাত এবং আরও অনেক কিছু। ইবন হাজম, ইবন খালদুনসহ আরও অনেক স্কলার তার নতুন সৃষ্টি করা মতবাদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। একাদশ শতাব্দীতে তার প্রবর্তিত ধর্ম বিলুপ্ত হয়।

ইবন তুমার্ট (১০৮০-১১৩০) ছিল দক্ষিন মরক্কের একজন আলেম ও রাজনৈতিক নেতা। সে ১১২১ সালে রমাদানের শেষে এক খুৎবা শেষে নিজেকে মাহদি বলে ঘোষণা দেয়। এরপর সে ১১২৫ সালে আল মোহাদ আন্দোলনের সূচনা করে।

সায়্যিদ মুহাম্মাদ জৌনপুরী ছিল সায়্যিদ বংশের অর্থাৎ হুসাইন বিন আলী (রা.) এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশের। সে মাত্র ৭ বছর বয়সে কুরআন হিফয করে, ১৪ বছর বয়সে 'আসাদুল উলামা' বা 'উলামাদের সিংহ' এবং ২১ বছর বয়সে 'সায়্যিদুল আউলিয়া' বা 'আউলিয়াদের নেতা' হিসেবে ভূষিত হয়। তিনি তার ধার্মিকতার ব্যাপারে খুব বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সে ৫৩ বছর বয়সে ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে কাবা তাওয়াফ করার পর রুকন ও মাকামের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে সে-ই প্রতিশ্রুত মাহদি এবং যে তাকে মাহদি হিসেবে বিশ্বাস করবে সে-ই একজন মুমিন। মিয়ান শাহ নিজাম আর কাযি আলাউদ্দিন বিদরী নামক দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি ভুয়া মাহদির সমর্থনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, "আমরা বিশ্বাস করলাম এবং একে সত্য হিসেবে গ্রহণ করলাম।" জৌনপুরী এক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করেছিলো তা হল যদি দুইজন আস্থাভাজন ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তির দাবীর সপক্ষে সমর্থন দেয় তাহলে সেটা প্রতিষ্ঠিত ও বৈধ হয়ে যায়। খুব সম্ভবত জৌনপুরী তার এই সাক্ষীর নীতি সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াত থেকে নিয়েছিল, এই আয়াতটি কুরআন ও হাদিস সঙ্কলনের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে সাহাবারা ব্যাবহার করেছিলেন। জৌনপুরী নিজেকে মাহদী দাবী করার পর মক্কার ওলামারা সাধারনভাবে তার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রায় ৭ অথবা ৯ মাস পর সে ইন্ডিয়ায় গিয়ে দুইবার নিজেকে মাহদী বলে দাবী করে - একবার আহমেদাবাদে এবং এরপর গুজরাটের ভাডলিতে। তবে ভাডলির ঘোষণাতে সে তার চূড়ান্ত দাবী হিসেবে উপস্থাপন করেছিলো। সে লোকজনকে বলেছিল তার জীবনবৃত্তান্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র সাথে মিলিয়ে দেখতে (সন্দেহ দূর করার জন্য)। যদি তার এই দাবীর পর তাকে ভুল ও ধর্মত্যাগী বুঝা যায় তাহলে যেন তারা তাকে হত্যা করে এবং বিচার দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আর যদি তারা হত্যা করতে না চায় তাহলে যেন তারা তাকে মেনে নেয় এবং তার অনুসরণ করে।

তার দাবীর পরে অনেক ওলামা তাকে মেনে নেয়, অনে ওলামা এই ব্যাপারে নীরব ভুমিকা পালন করে তবে বিশ্বময় জ্ঞানী ও হকপন্থি ওলামারা তার তীব্র বিরোধীতা করেন।

ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিয়াজ উল ইসলাম এর বর্ণনা মতে, ইতিহাসে যেসব মানুষ নিজেকে মাহদী বলে দাবী করেছিলো তাদের মধ্যে সায়্যিদ মুহাম্মাদ জৌনপুরী ছিল ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের আলেম এবং তার জীবনযাত্রার মান ছিল ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ। সে কোন রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নিজেকে মাহদী বলে দাবী করেনি। যখন তার অনুসারীরা তাদের প্রতিপক্ষের উপর অস্ত্র চালানোর ব্যাপারে অনুমতি চাইলো, তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা তোমাদের নিজেদের কুপ্রবৃত্তির উপর অস্ত্র চালাও। মাহদীর সাহায্যকারী হল আল্লাহ্ নিজে।"

মোটকথা, তার সামগ্রিক ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করেই অনেকে তাকে মাহদী মনে করত। তার অনুসারীদের মাঝে প্রায় সব ধরণের লোকই ছিল। অনেক রাজা, মহান ব্যক্তিত্ব সহ এরকম আরও অনেকে তাদের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কথিত মাহদীর সাথী হয়েছিলো যার ফলে তার সার্কেলে অন্ধ মানুষ থেকে শুরু করে দক্ষ,মেধাবী,সুশিক্ষিত প্রায় সকল প্রকারের মানুষের সমাগম ঘটে। তার অনুসারীদের ব্যাপারে খায়রুদ্দিন মুহাম্মাদ ইল্লাহবাদি উনার কিতাব জৌনপুরনামাতে (পঞ্চম অধ্যায়) বলেন যে তিনি তার অনুসারীদের আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত চোখ ও ভগ্ন হৃদয় অবস্থায় দেখেছেন। তারা সবসময় কুরআন এর পিছে অধ্যবসায় করত এবং আমলের দিক থেকে তারা খুব শক্ত ছিল। যদিও তারা ইমাম আবু হানিফার অনুসরণ করত কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা লক্ষ্য রাখত তারা আবু হানিফাকে অনুসরন করতে গিয়ে সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে কিনা। তারা অন্ধ অনুসরনে বিশ্বাসী ছিল না।

জৌনপুরির এই অনুসরণকারী দলটি মাহদাওিয়া নামে পরিচিত। তাদের একটি অফিসিয়াল সাইট ছাড়াও বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট আছে।

দক্ষিণ মরক্কের সুফি নেতা আহমাদ ইবন আবি মাহালি (১৫৫৯-১৬১৩), ইন্ডিয়ার ধর্মীয় নেতা মহামতি প্রনথ (১৬১৮-১৬৯৪) এদের নামও উল্লেখযোগ্য।

ইমাম হুসাইনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর যে বাবিসজম মতবাদের প্রবর্তক (যা পরবর্তীতে বাহাই মতবাদের জন্ম দেয়) আলী মুহাম্মাদ শিরাজি (১৮১৯-১৮৫০) নিজেকে মাহদি ও নবী বলে দাবী করে।

সুদানের সুফি মুহাম্মাদ আহমাদ (১৮৪৪-১৮৮৫) ১৮৮১ সালের জুনের ২৯ তারিখ নিজেকে মাহদি বলে দাবী করে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে আহমাদিয়া মুসলিম জামায়াত বা কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ (১৮৩৫-১৯০৮) নিজেকে মুজাদ্দিদ,মাহদী, ঈসা এমনকি শেষ নবী বলেও দাবী করে। সে ছিল মূলত ব্রিটিশদের এজেন্ট। কাদিয়ানী মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে অনেক কিতাব এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে, বাংলাতেও অনেক কিতাব আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলাদেশে এরা সরকারের সাহায্যে সহজেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১৪০০ হিজরির প্রথম দিনে (১৯৭৯ সালের ২০ই নভেম্বর) নজদের অন্যতম প্রধান গোত্রের সন্তান জুহাইমান আল ওতাইবি তার ব্রাদার-ইন-ল মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল কাহতানীকে মাহদী বলে দাবী করে। এই দাবী করার পিছনে তাদের যুক্তি ছিল এই যে, আবদুল্লাহ আল কাহতানির নাম ও তার পিতার নাম রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম ও উনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতার নামের মতো একই এবং সে মক্কার উত্তর দিক থেকে এসেছে। এদিন ওতাইবির নেতৃত্বে পবিত্র কাবা দখল করা হয়। ওতাইবির নেতৃত্বে থাকা সুসংগঠিত দলটিতে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জনের মতো বিদ্রোহী ছিল, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুও ছিল। দখলের পরপরই সৌদি মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিওরের প্রায় ১০০ জন সিকিউরিটি অফিসার পুনরুদ্ধারে এগিয়ে গেলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পিছু হটে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কাবা শরীফকে দখল করে রাখার পর সৌদি স্পেশাল ফোর্স ফ্রান্সের স্পেশাল ফোর্সের সহযোগিতায় দুই সপ্তাহের বেশী সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ চালিয়ে কাবা শরীফকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করে। এই যুদ্ধে প্রায় ২৫৫ জন মানুষ (আটকে পরা মুসলিম,সেনা ও বিদ্রোহী) নিহত হয় এবং প্রায় ৫৬০ জন আহত হয় (এটা অফিসিয়ালি হিসেব, সংখ্যায় এর পার্থক্যও দেখা যায়)। পরে সৌদি সরকার জুহাইমান আর তার ৬৭ অনুসারীর শিরচ্ছেদ করে।

রিয়াজ আহমেদ গোহার শাহী (জন্ম : ১৯৪১) নিজেকে মাহদী, মাসিয়াহ ও কাল্কি অবতার হিসেবে দাবী করেছিলো। সে Messiah Foundation International এর প্রতিষ্ঠাতা।

ইরাকের দিয়া আবদুল যাহরা কাদিম (১৯৭০-২০০৭) ছিল একটি সশস্ত্র শিয়া গ্রুপ “জুন্দ আল শামা” এর নেতা। সে নিজেকে শিয়া মতবাদের বারতম ইমাম ও মাহদী বলে দাবী করে।

শিয়াদের মধ্যে নিজেকে মাহদি (তাদের আকিদামতে বারোতম ইমাম হল মাহদি যে লুকিয়ে আছে) দাবী করার প্রচুর প্রবণতা দেখা যায়। শিয়া প্রধান দেশ ইরানে সেমিনারি এক্সপার্ট মেহদী গাফারি’র বক্তব্য অনুযায়ী এমন ৩০০০ ব্যাক্তি জেলে আছে যারা নিজেদের মাহদি বলে দাবী করেছিলো এবং প্রতি মাসেই কেউ না কেউ নিজেকে মাহদি বলে দাবী

করে। উল্লেখ্য, ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ তার প্রশাসনকে “The government of the hidden imam” হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং ইরানি নতুন দূতাবাসগুলোকে “মাহদীর দূত” হিসেবে বিবেচনা করে।

শিয়াদের মধ্যে নিজেকে মাহদী দাবী করেছে এমন ব্যাক্তি অসংখ্য হওয়াতে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে :

আলী (রা.)’র ভাই জাফর ইবন আবি তালিবের নাতনীর ছেলে আবদুল্লাহ ইবন মুওাওিয়া (সে কুফা ও পারস্যে উমাইয়্যাদ খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলো), মুহাম্মাদ ইবন হাসান আল মাহদী, আবদুল্লাহ আল মাহদী বিল্লাহ প্রমুখ। এছাড়াও আরও অনেক ব্যাক্তি আছে যাদেরকে তাদের অনুসারীরা মাহদী হিসেবে দাবী করে।

হেযবুত তাওহীদ এর প্রতিষ্ঠাতা বায়েজিদ খান পন্নী ওরফে এমামুয্যামান টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান। সে নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করেছিলো। তারা এদেশে তাদের ভ্রান্ত ধারণা বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা দুটি নিউজ সাইট (দেশেরপত্র, দৈনিক নিউজ) পরিচালনা করছে যেখানে বিভিন্ন নিউজের পাশাপাশি তারা তাদের মতাদর্শ প্রচার করছে। সংগঠনের নামে একটি ফেসবুক পেজ আছে। এসো আল্লার পথে নামের একটি ফেসবুক পেজের একটি পোস্ট দেখে মনে হয় সেটা হেযবুত তাওহিদের প্রচারনার জন্য।

নিজেকে ইমাম মাহদি বলে দাবী করা লুতফুর রহমানকে ঢাকার গোপীবাগে খুন করা হয়।

২। ইবলিসি শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হতে পারে যে, তারা আসল মাহদির অপেক্ষায় থাকবে এবং তার এজেন্ট ও প্রপোগান্ডার মাধ্যমে তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টা করবে। এর জন্য তারা প্রতিটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সেবা গ্রহণের চেষ্টা চালাবে, যেমনটি এযুগেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বিষয়টি সহজে বুঝবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কিছু সমর্থক সহযোগী থাকে, আবার কিছু বিরুদ্ধবাদীও থাকে। আপনি যে কোন মতাদর্শের নেতাকে দেখুন, দেখবেন, কিছু লোক তার জন্য নিবেদিত প্রাণ আবার কিছু মানুষ তার ঘোর সমালোচক। এমনকি তাদের কাফেরদের এজেন্ট আখ্যায়িত করার লোকেরও অভাব হবে না। প্রত্যেক মতাদর্শের লোকেরা আপন আপন নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। কেউ যদি তার নেতাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তির আজকাল খুব নামডাক শোনা যাচ্ছে। শুনেছি, তিনি অনেক বড় একজন আল্লাহর ওলী। অনেক ত্যাগী আলেম। তো হযরত তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তার ব্যাপারে এই হযরত যে অভিমত ব্যক্ত করবেন, তার পুরো অঙ্গনে সেই অভিমতই অনুসৃত হবে। হযরত যদি বলে দেন, সরকারের লোক; তার থেকে দূরে থাকো, তাহলে দেখবেন, লোকটি যুগের আবদালই হোক না কেন, ফেরেশতারা তার চলার পথে পালক বিছিয়ে দিক না কেন, হজরতের ফতোয়ার পর তার গোটা ভক্তমহল তাকে “সরকারের দালাল” বলে আখ্যায়িত করবে।

এটি এমন এক ব্যাধি, যাতে সমাজের সেই শ্রেণীটি বেশি আক্রান্ত, যার প্রতিজনের হাতে সত্যের পতাকা রয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হল, প্রতিজন সদস্যের পতাকা একজনেরটি অপরজনের থেকে ভিন্ন। তাছাড়া একই মতাদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের দাবি, আমার পতাকাই সত্যের পতাকা।

আহ, তারা যদি নিজ নিজ আমিত্বের পতাকাগুলোকে অবনমিত করে ফেলত, তা হলে আল্লাহর কসম, সত্যের পতাকা তাদেরই হাতে বিশ্বময় পতপত করে উড়ত। হায়, যদি তারা আপন মন মস্তিস্ক ও চিন্তা চেতনার সীমাবদ্ধ সীমান্তগুলোকে অসীম করে ফেলত, তাহলে আজ জল ও স্থল, মরু ও মহাশূন্য সব তাদের ধ্বনিতে মুখরিত থাকতো। যদি তারা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে দালালির ফতোয়া আরোপের পরিবর্তে ইসলামের শত্রুদের প্রতি মনোনিবেশ করতো, তাহলে শুধু তাদেরই সারি থেকে কেন, সকল ক্ষেত্র থেকে শত্রুর এজেন্টরা নির্মূল হতো। দাজ্জালের এসব ভয়াবহ ধোঁকা ও প্রতারণার কথা ভেবে মুমিন জননী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর মতো মহান ব্যক্তিগণও কেঁদে উঠতেন। মহানবীর সাহাবাগণও ক্রন্দন করতেন।

এ ছিল তাদের পরকালের ভয়। অন্যথায় তাদের মতো ব্যক্তিত্বদের সমস্যার কিছু ছিল না। যে লোকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত, নূরে এলাহি দ্বারা যাকে পথ দেখানো হয়ে থাকে, তার আবার ভাবনা কিসের। চিন্তা তো থাকা দরকার গুনাহগারদের। কিন্তু আফসোস! আমরা কখনও ভেবে দেখার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করি না। আর এমনভাবে নিশ্চিন্তমনে জীবন অতিবাহিত করছি, যেন কোন ফিতনাই নাই।

দাজ্জাল ও মিডিয়াযুদ্ধ

খলীফা আব্দুল হামিদ দ্বিতীয় (১৮৪২-১৯১৮, ইসলামী খেলাফতের ৯৯ তম খলীফা এবং তুরস্কের উসমানিয়্যা সাম্রাজ্যের ৩৪ তম সুলতান) পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিলেন। তা হল, 'এগুলো শয়তানের সন্তান।' কিন্তু তিনি যদি এ যুগের মানুষ হতেন, তাহলে একে 'দাজ্জালের চোখ ও কণ্ঠ' নাম দিতেন।

দাজ্জাল আরবি 'দাজলুন' থেকে ব্যুৎপন্ন। 'দাজলুন' অর্থ আচ্ছাদিত করা। দাজ্জাল অর্থ অনেক আচ্ছাদনকারী। দাজ্জালকে এজন্য দাজ্জাল বলা হয় যে, সে নিজের মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে সত্যকে ঢেকে ফেলবে। প্রতারণার মাধ্যমে সে বড় বড় লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে। তার ধোঁকা ও প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মানুষ দেখতে না দেখতে ঈমান থেকে হাত ধুয়ে বসবে।

পুরো ইলেকট্রনিক মিডিয়া (স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেট) ও প্রিন্ট মিডিয়া জগতকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়।

১) সংবাদ মাধ্যম (নিউজ চ্যানেল, ছাপানো নিউজ পেপার, অনলাইন নিউজ পেপার)

২) বিনোদন মাধ্যম (কমার্শিয়াল চ্যানেল, চলচ্চিত্র ও নাট্য শিল্প সংস্থা)

৩) যোগাযোগ মাধ্যম (সহজলভ্য ইন্টারনেট ও সুলভ মূল্যে মাল্টিমিডিয়া মোবাইল ফোন ও নিম্ন কলরেট)

৪) প্রচার মাধ্যম (বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল, নিউজ পেপার ও বিলবোর্ডের অ্যাড)

১) সংবাদ মাধ্যমঃ পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলোর কর্মধারাও অনেকটা এরকম - তারা যে বাস্তবতাকে পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে লুকানো প্রয়োজন বোধ করছে, তার গায়ে তারা সংশয় ও সন্দেহের এমন চাদর জড়িয়ে দেয় যে, মানুষ তার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে যে বিষয়টিকে তারা প্রমাণিত করার ইচ্ছা করে, মিথ্যার হাজারো সুদর্শন

গেলাফ চড়িয়ে তাকে সপ্রমাণিত করে ছাড়ে। যেমন - তারা যদি আজ সংবাদ প্রচার করে, সমগ্র অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রে ডুবে গেছে, তা হলে এই 'পশ্চিমা মিডিয়ায় আস্থাশীল বিশ্ব' এর জন্য সংবাদটি বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না।

আর বর্তমানে এই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও সংস্থাগুলো সারা বিশ্বে নিজেদের অবস্থান এমনভাবে গত এক শতকে পাকা করে নিয়েছে যে, বিশ্বের প্রতিটি ভূখণ্ডেই স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোও এই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও সংস্থাগুলোর সংবাদের উপর ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক সব সংবাদ প্রচার করে। ফলে যখন কোন ভূখণ্ডে একটি ঘটনা ঘটে, স্থানীয়ভাবে ওই ভূখণ্ডে ঐ ঘটনা সম্পর্কে যে সংবাদই প্রচার হোক না কেন, বিশ্ব সেটাই জানবে যা কিনা এই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও সংস্থাগুলো প্রচার করবে।

সুতরাং, দাজ্জাল যখন সশরীরে এসে নিজের খোদা হওয়ার ব্যাপারে দাবি করবে, এই ইহুদি- খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণাধীন এই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও সংস্থাগুলো সারা বিশ্বে সগৌরবে তা প্রচার করবে এবং এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের মুসলমান নামের দাবিদার প্রথম ধাক্কাতেই তা বিশ্বাস করে ঈমান হারিয়ে ফেলবে।

২) বিনোদন মাধ্যমঃ সকল প্রকার বিনোদন চাই তা সিনেমাই হোক বা নাটকের মতো স্বল্প দৈর্ঘ্য সিনেমাই হোক, এক কথায় এগুলোর গুরু হল হলিউড - সরাসরিই হোক বা ঘুরিয়ে পেচিয়েই হোক। হলিউডকে ইবলিসের মতবাদের দুর্গ আখ্যায়িত করাই অধিক সঙ্গত। দাজ্জালি ব্যবস্থাপনার পথকে সুগম করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। এমন একটি বস্তু, যার অস্তিত্ব জগতে নাই, তাকে বাস্তবতার রূপ দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা এবং মডার্ন চরিত্রের মানুষদের মস্তিষ্কে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই। এই প্রতিষ্ঠানটি ইহুদীদের প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনাসমূহের পক্ষে জনমত তৈরি করছে। বিশেষ করে ইদানিং বিভিন্ন সিনেমায় দেখানোর চেষ্টা করছে, সারা বিশ্বে প্রচুর গণ্ডগোল, অশান্তি আর বেইনসাফী। আর এগুলোর উপশমে/পরিত্রাণে হাজির হচ্ছেন এক মহানায়ক। কখনও মানুষ রূপে বা ভিনগ্রহ থেকে এলিয়েন রূপে। আর কার্টুন সমূহে তো আছেই সুপারম্যান, ব্যাটম্যান আর বেন টেন নামে প্রবল শক্তির অধিকারী একজন যে কোন বিপদ হতে মুক্তিদাতা। আর এর পাশাপাশি ব্যভিচার আর অশ্লীলতাকে বিশ্বব্যপী শিল্পের রূপ দেওয়ার ব্যাপারে এই হলিউডেরই সহদোর মূর্তিপূজারীদের বলিউডের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিষয়টি এখন আর খোলাসা করে বলার কিছু নেই। আক্ষেপের বিষয় হল, বিভিন্ন ভূখণ্ডের বুদ্ধিজীবী নামধারীরা এই সকল মিডিয়ার নর্তকী- গায়িকার আঙুলের ইশারায় পুতুলের মতো নাচছে। কিন্তু তারপরও প্রগতিবাদী ও মুক্তচিন্তার বাহক ভাবছে। অথচ বাস্তবতা হল, তাদের বিবেক বুদ্ধি সেই কবে হলিউড আর নিজ ভূখণ্ডে হলিউডের শাগরেদ কমার্শিয়াল চ্যানেল, চলচ্চিত্র ও নাট্য শিল্প সংস্থার কাছে নিলাম হয়ে গেছে।

৩) যোগাযোগ মাধ্যমঃ এই খাতে সহজলভ্য ইন্টারনেট ও সুলভ মূল্যে মাল্টিমিডিয়া মোবাইল ফোন ও নিম্ন কলরেট একটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং রাখবে। 'গ্লোবাল ভিলেজ' এর কনসেপ্টকে মাথায় রেখে বিশ্বের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিটি সংবাদ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। যদিও প্রথমে মানুষের দৈনন্দিন কাজের সুবিধার্থে এই তারহীন ফোন ব্যাবস্থার শুরু আর মার্কিন সেনাবাহিনীর অফিসিয়াল কাজে ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেটের আবিস্কার। কিন্তু কালের বিবর্তনে আর প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সুযোগে বানিজ্যিকভাবে এই সকল প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়ে সহজলভ্যতা ও কলরেটকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে এখন তা প্রয়োজনীয়তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এখন এগুলো অবদান রাখতে শুরু

করেছে যুবক যুবতীর অবৈধ সম্পর্কে টিকিয়ে রাখতে। মাল্টিমিডিয়া সেটে ফোনে কথা বলার সুবিধার পাশাপাশি ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এখন এখন আর প্রয়োজনীয় ইমেইল যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন তা গান, মুভি আর ফেসবুক চ্যাটিং এর ভিন্ন বিশ্ব। খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই পারছেন শরীয়তের সীমার ভিতরে থেকে এই সব প্রযুক্তি ব্যাবহার করতে। দুর্বল ঈমানের যুবক যুবতীরা ঘরে বসে কোন নড়াচড়া ছাড়াই দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে গড়ে তুলছে পাপের পাহাড়।

৪) প্রচার মাধ্যমঃ এই মিডিয়া জগতকে প্রচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার পণ্যের প্রচার করতে গিয়ে আবারও যেন মনের অজান্তেই শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছে। বিলবোর্ডসহ নিউজ পেপার ও বিভিন্ন চ্যানেলে অ্যাড দিতে গিয়ে যেন নারীকে পণ্যের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। ব্যভিচার আর অশ্লীলতাকে পুঁজি করে তৈরি করছে অ্যাড। স্বল্প সময়ের এই এক একটি অ্যাড এ ঈমান- আকিদা ও শরীয়তের বিধান তথা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কথাই থাকে যা মনের অজান্তে কোমল মতি শিশুদের মনে ঢুকে যায় এবং সেগুলোকেই সত্য ও সঠিক বলে ধরে নেয়। যার ফলে পরে তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষাকে গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, এমন কি কখনও কখনও চ্যালেঞ্জ করে ঈমানহারা হয়ে পড়ে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (New World Order) নাকি দাজ্জালের আগমনের পূর্ব প্রস্তুতি

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বেই ইহুদী ব্যাংকাররা পৃথিবীতে নতুন এক বিশ্ব ধর্ম আমদানী করার চেষ্টা করেছিল। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা ১৯৯২ সালে “নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার” নামে একটি নতুন সিস্টেম পৃথিবীবাসীর সামনে প্রণয়ন করে। বস্তুত এটি আসলে একটি নতুন ধর্ম; যার মূলভিত্তিই হচ্ছে মনোবৃত্তি আর ধর্মনিরপেক্ষতা। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নতুন এই ধর্মকে প্রচার করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, ১৯৯২ সালের পর থেকে কত দ্রুত পর্যায়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন এসেছে।

বাহ্যত এই সিস্টেমটি যদিও পৃথিবীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু একে একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধানাকারে রূপ দেওয়া হয়েছে। চারিত্রিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে একমাত্র ইসলামই এর সামনে বাঁধা ছিল বিধায় ইসলামের ঐ সকল শিক্ষাকে মিটিয়ে দেওয়ার জোর চেষ্টা চালানো হয়; যেগুলো এই নতুন পদ্ধতির সামনে বাধা হয়ে আসতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে এ নতুন সিস্টেমের আওতাভুক্ত করাই ছিল আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। আপনি দেখে থাকবেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য সমাজে কীরূপ তৎপরতা চালানো হচ্ছে - মানুষের পোশাক, খানা পিনার টাইম নির্ধারণ, শুয়া ও ঘুম থেকে জাগা, জীবন পরিচালনা, বিবাহ কখন হওয়া উচিত, সন্তান কয়জন হলেই চলবে, মনোচাহিদায় এক ধাপ এগিয়ে থাকা, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের নামে যৌন সম্পর্কের প্রচার, কাজ কর্মের ধাঁচ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে লোকদেরকে টেনে ঐ নতুন ধর্মে প্রবেশ করানো হয়েছে। শুধু এই অনৈসলামিক জীবনবিধানকে পৃথিবীতে চালু করেই ক্ষান্ত নয়, বরং এছাড়া অন্য যত ধর্ম পৃথিবীতে আছে, সেগুলোকে জীবনবিধানরূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে যথারীতি যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীর সবকটি রাষ্ট্রকে আয়ত্তে এনে নতুন এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে “জাতিসংঘ” নামক প্রতিষ্ঠানটি সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অতঃপর একে রক্ষার জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুগত সেনাবাহিনীকে ওখানে নিযুক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকেই

নতুন এই ধর্মের উপর আমল করতে হবে, নতুবা তাকে “মৌলবাদী বা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র” সাব্যস্ত করে পাথরের যুগে পৌঁছে দেওয়া হবে। সেটিকে আক্রমণ করা হবে, তারপর নিজেদের মনোপুতঃ শাসক বসানো হবে অতঃপর প্রয়োজন হলে শান্তিরক্ষা মিশন নামক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুগত সেনাবাহিনীর একটি অংশকে পাঠানো হবে।

সুদি কারবারী এই ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সুতরাং টাকা পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে সুদি সিস্টেম ছাড়া অন্য কোন সিস্টেম গ্রাহ্য হবে না। তবে নামকাওয়াস্তে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, হিন্দু ব্যাংক, খাঁটি রোমান ক্যাথলিক ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি। তবে শর্ত হচ্ছে, সিস্টেম অবশ্যই সুদি হতে হবে, শুধুমাত্র পরিভাষা পরিবর্তন করার অনুমতি রয়েছে।

নতুন এ ধর্মে নারিজাতিকে সম্মানের খাটিয়া থেকে ফুতপাত, সড়কে দাড় করিয়ে পুরুষদের মনোচাহিদা পূরণের অন্যতম উৎস করা হয়েছে। পৃথিবীতে নারিজাতির সাথে এখন এমনই ইনসাফ ও আচরণ করা হবে। চায় রাজী থাকুক বা না থাকুক।

নতুন এ ধর্মের ব্যাখ্যা ডক্টর জন কোলেমান (Dr. John Coleman) তার Conspirators Hierarchy: The committee of 300 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে এই নতুন ধর্ম মানুষের মাঝে প্রবেশ করাচ্ছে। ডক্টর জন কোলেমানের বক্তব্য পড়ার পর আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, “নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার” শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আধুনিক পদ্ধতি নয়, বরং তা পূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা এবং নতুন একটি ধর্ম। তিনি লিখেনঃ

“এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা, যাকে একটি মাত্র আন্তর্জাতিক সরকার শাসন করছে। এটি অনির্বাচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু ব্যক্তিদের আয়ত্তে রয়েছে। সম্ভবত মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থার আকারে নিজের চাহিদামত বিষয়গুলো নির্বাচন করছে। নতুন এ আন্তর্জাতিক সিস্টেমে পৃথিবী জুড়ে বসবাসকারীদের সংখ্যা সীমিত থাকবে এবং প্রত্যেক বংশেই সন্তান সংখ্যার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে। কোন অঞ্চলে বেশি থাকলে যুদ্ধ এবং মহামারী ছড়িয়ে সেখানকার জনসংখ্যা কন্ট্রোল করা হবে। শুধুমাত্র ঐ পরিমাণ বাকি থাকবে, যে পরিমাণ থাকলে ওখানকার সরকার তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কন্ট্রোল করতে সক্ষম হয়।

কোন মধ্যম স্তর বাকি থাকবে না। শুধু বিচারক থাকবে এবং প্রজা থাকবে। সমস্ত বিচারকার্য সারা পৃথিবী জুড়ে একই নিয়মে পরিচালিত হবে। এগুলো বাস্তবায়নে একপক্ষীয় সরকারী পুলিশ এবং জাতিসংঘ সেনাবাহিনী পৃথিবীর সর্বস্থানে বিরাজমান থাকবে। তখন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র/প্রদেশ ভিত্তিক বিভক্ত থাকবে না। সকল কার্যক্রম এক সরকারের সংবিধানমতে পরিচালিত হবে। যে সকল লোক এক সরকারী নিয়মের অনুসারী হয়ে যাবে, তাকে জীবন ধারণের সকল আসবাবপত্র সহজে দেওয়া হবে। আর যারা এর বিরুদ্ধাচারন করবে, তারা ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাবে অথবা তাদেরকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা দেওয়া হবে। যে কেউ চাইলেই তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে পারবে। কোনরূপ অস্ত্র- সস্ত্র, হাতিয়ার বা কোনরূপ ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু সাথে রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

শুধুমাত্র একটিই ধর্ম পালন করার অনুমতি বাকি থাকবে। আর সেটা হবে আন্তর্জাতিক আধুনিক আকৃতিতে, যার সূচনা ১৯২০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। শয়তানী, ইবলিসি আর জাদুবিদ্যাকে সরকারী অধিকার বলে মনে করা হবে। এটা করা হবে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য, যেখানে কাউকে ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা প্রদান করা হবে না, এমনকি গণতান্ত্রিক বা রাজতন্ত্রিক বা মানবাধিকারের কোন অনুমতি সেখানে থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির (চায় পুরুষ হোক বা মহিলা) অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে দেওয়া হবে যে, সে এক সরকারের সৃষ্ট ব্যক্তি। তার উপর একটি পরিচয়পত্র (আই ডি

নম্বর) লাগিয়ে দেওয়া হবে। এই পরিচয় নম্বরটি একটি কেন্দ্রীয় তথ্যাগারে (Central server) থাকবে। সর্বদা সেটি একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সির তদারকিতে থাকবে।

বিবাহ করাকে অসংবিধানিক অথবা সেকেলে রীতি বলে আখ্যায়িত করা হবে। তখন আজকালের মতো বংশীয় জিন্দেগী অবশিষ্ট থাকবে না – বাচ্চাদেরকে শিশুকালেই পিতামাতা থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। সরকারী তদারকিতে ওয়ার্ডসে তাদের লালন পালন করা হবে। যুবক যুবতীদেরকে সম্পূর্ণ যৌন স্বাধীনতা দেওয়া হবে। নারীদেরকে নিজে নিজে গর্ভপাত ঘটানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং দুই সন্তান হওয়ার পর নারীরা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করবে। প্রতিটি নারীর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সরকারের কম্পিউটারে বিস্তারিত তথ্য বিদ্যমান থাকবে। দুটি সন্তান হওয়ার পরও যদি কোন নারী গর্ভবতী হয়ে যায়, তবে তাকে জোরপূর্বক গর্ভপাত করানোর জন্য ক্লিনিকে নিয়ে চিরদিনের জন্য বন্ধ্যা করে দেওয়া হবে।

যুবক যুবতীদের যৌন মেলামেশা ব্যাপক করার জন্য ম্যাগাজিন এবং ন্যাকেড ফিল্ম তৈরি করা হবে। প্রত্যেক সিনেমায় আবশ্যিকভাবে একাংশ ওপেন ন্যাকেড সিন রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে। মানসিক শক্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাদি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে। মানসিক শক্তি কন্ট্রোল করার জন্য এ জিনিসগুলো খাদ্য ও পানীয়র মাঝে লোকদের অজ্ঞানে মিশ্রন করা হবে। সকল শিল্পানী বিষয়সমূহ রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বদের আন্তর্জাতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে। বয়োবৃদ্ধ এবং স্থায়ী রোগীদের জন্য বিষের টিকা গ্রহণে বাধ্য করা হবে। পৃথিবী থেকে অধিকাংশ বৃদ্ধ, কর্মহীন ব্যক্তিত্ব এবং খাদ্যের শত্রুদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে।”

গ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এর অনেকটাই আপনি বাস্তবায়নের প্রয়াস বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। বর্তমান পৃথিবীকে একটি আন্তর্জাতিক গ্রাম বানানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, এর মূল উদ্দেশ্যও তাই যে, সকল নেতৃত্ব একটি মাত্র বিশ্বশক্তির হাতে থাকুক। যাতে বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সকলের উপর সার্বিক নজরদারি করা সহজ হয়।

শোনা যাচ্ছে, “নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার” কে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে ভিসাবিহীন রাষ্ট্র বা সীমানাহীন বিশ্ব। মূলত এই “নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার” আর কিছুই নয়, দাজ্জালের এডভান্স ফোর্সের বিশ্বব্যপি প্রস্তুতি। যাতে দাজ্জাল যখন এসে নিজেকে রব বলে দাবি করবে, তখন যেন তার আসলেই বিশ্বের উপর একক নিয়ন্ত্রন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু প্রতিটি মুসলমান জানে, দাজ্জাল ঐ সময়ই বের হতে পারবে, যখন আল্লাহপাক তা চাইবেন। দাজ্জালের এই ক্ষমতা নেই যে, স্বীয় ক্ষমতায় বের হয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই গোটা বিশ্ব তথা গোটা মুসলিম উম্মাহ ধীরে ধীরে এই চূড়ান্ত পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দাজ্জালের জন্য অপেক্ষামান শয়তানপূজারী (Satanist) ও জাদুবিদ্যার রুপকারগণ

এর আগের লেখাতেও উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআন ও হাদিসে 'শয়তান' শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

"অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু স্থির করেছি - মানুষ শয়তান ও জীন শয়তান।"(সূরা আন'আম,৬: ১১২)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আবু যর, তুমি মানুষ ও জীন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ কি? উত্তরে আবু যর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, শয়তান কি মানুষের মধ্য থেকেও হয়ে থাকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, মানুষ শয়তানের অনিষ্টতা জীন শয়তানের চেয়ে বেশি হয়।

বর্তমান সময়ে যথারীতি এমন একটি দল বিদ্যমান, যারা শয়তানের (ইবলিসের) পূজা করে থাকে। দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি তাদের অনেক অনুসারীও রয়েছে। অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এদের অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন চলচ্চিত্র সংস্থা "হলিউড" এর প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীর অনেকেরই ধর্ম হচ্ছে শয়তানকে সন্তুষ্ট করা। বিশ্বের অনেক প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। দেখবেন, এদের অনেক কনসার্ট প্রোগ্রামে শ্রোতারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মূলত তাদের উপর শয়তান প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে তাদেরকে অচেতন করে দেয়।

এটা হচ্ছে পূর্ণ একটি শয়তানী দল, তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে "গড" (GOD) শব্দটি অত্যাধিক হারে ব্যবহার করে থাকে। তারা ইবলিসকে স্বীয় খোদা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ইহুদীদের গোপন সংগঠন "ফ্রি মেসন" এর ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা ও অধ্যায়নের পর এ বিষয়টি সামনে আসে যে, সে ইবলিস (Lucifer) কে খোদা মনে করে।

আমেরিকার সরকারী ধর্মও হচ্ছে শয়তানের পূজা করা। আমেরিকার প্রতিটি ডলারে তাদের ঘোষণা - In God We Trust "আমরা খোদার উপর ভরসা রাখি।" এই বাক্যটি দ্বারা মূলত দাজ্জালকে উদ্দেশ্য করে থাকে, খ্রিস্টানদের খোদা নয়। আপনি খেয়াল করে থাকবেন, সেখানে যেই পিরামিডের নিচে কথাটি লিখা আছে, সেই পিরামিডের চূড়ায় একটি এক চোখের ছবি। অথচ হবার কথা ছিল ক্রুসের ছবি। এই দলের একমাত্র লক্ষ্য এবং টার্গেট হচ্ছে - ধর্মীয় (মানবতার) বিষয়গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে সারা বিশ্বে শয়তানী রীতিনীতি এবং আচার আচরণে মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়া। মানুষকে পরিপূর্ণভাবে শয়তানী ঢং এ রূপান্তরিত করা। জিনা, মদ্যপান, জুয়া, সুদ, হত্যাযজ্ঞ, মানুষের গোশত খাওয়া ... ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলোই হচ্ছে শয়তানী ধর্মের অংশবিশেষ। আর এসব কিছুই করা হচ্ছে রুহানিয়্যাত তথা আত্মিকতার নামে।

শয়তানের পূজারী প্রায় সারা বিশ্ব জুড়েই বিদ্যমান রয়েছে। বড় বড় শিল্পপতি এবং শহরের লোকদের থেকে এর সূচনা হয়ে থাকে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলোর দায়িত্বে থাকা লোকজন অতিদ্রুত শয়তানী ধর্মের অনুসারী হয়ে যায়। কেননা, তারাই শয়তানী চাহিদাকে একটি সুন্দর আকৃতি বানিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। শয়তানের পূজারীদের উপাসনার নিয়ম হচ্ছে - রাতের মধ্যভাগে সকল পুরুষ-মহিলা কালো পোশাক পরে একস্থানে একত্রিত হয়। পোশাকের উপর শয়তানী চিহ্ন ও ছবি লাগানো থাকে। গলায় বিশেষ ধরনের শিকল ও তামা লটকানো থাকে। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝখানে মানুষের মাথার একটি কঙ্কাল রাখে। কঙ্কালের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে অত্যন্ত উচ্চ আওয়াজে মিউজিক চালু করা হয়। নেশা সৃষ্টিকারী ওষুধ খেয়ে সকলেই একজন আরেকজনের হাত ধরে আগুনের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। অতঃপর প্র্যাকটিক্যাল পর্যায়ে শয়তানকে সন্তুষ্ট করার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে -

যতবেশি মদ্যপান এবং জিনায় লিপ্ত হবে, ততবেশি শয়তান সন্তুষ্ট হবে। জিনার ক্ষেত্রে এরা সামাজিকতার বা আত্মীয়তার কোন বাধনকেই তোয়াক্কা করে না। এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা মানব স্বাধীনতায় অন্তরায় সৃষ্টি করার শামিল।

সড়কের সাইডে ব্যানার/সাইনবোর্ডে, দোকানের সাইনবোর্ডে এবং অন্যান্য অ্যাডসমূহে মাঝে মাঝে আপনি আশ্চর্য ও বিরল বাক্য দেখতে পাবেন, যা ঐ বিজ্ঞাপনের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান। যেমন – I am present and I am moving on, Was I am I will be. এগুলো মূলত শয়তানের বার্তা বহন করছে।

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বে জাদু এবং শয়তানী তৎপরতাগুলোকে সরকারী পাঠ্যগত বিষয় আকারে রূপ দেওয়া হবে। বর্তমানে এক্ষেত্রেও তাদের তৎপরতা চালু হয়েছে। গোপন আত্মার সাথে কথা বলা শেখানো হচ্ছে। এরকম অনেক জাদুকর নিজেকে "পীর" বলে দাবি করে মানুষের বায়াত নেয় কিন্তু ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আকিদা পোষণ করে না। আবার কাশফের দাবি করে। আর অনেক দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও তাদের পরিবার তাদের মুরিদ হয়ে মূলত ঈমানহারা হচ্ছেন।

মূলত দাজ্জালের আগমনের আগেই তার অনুসারী সৃষ্টির তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে।

বোহেমিয়ান ক্লাবঃ শয়তানের পূজারীদের গোপন সংস্থা

বোহেইমিয়ান ক্লাব এমন একটি গোপন সংস্থা, যারা ব্যাপারে খুব কমই খবর প্রকাশ হয়। আর মিডিয়া কখনই প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে চায় না যদিও অনেক সময়ই অনেক অনুসন্ধিৎসু মানুষের কারনে তা ফাঁস হয়ে যায়। আমেরিকার উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত প্রাচীন রেডউড ফরেস্টের ২৭০০ একর জুড়ে রয়েছে বোহেইমিয়ান গ্রোভ নামের একটি এলাকা, যা প্রকৃতপক্ষে বোহেইমিয়ানদের (বোহেইমিয়ান ক্লাবের সদস্য) দখলে রয়েছে। কিন্তু এই বোহেইমিয়ানরা কারা ?

সদস্যদের সম্পর্কে জানার আগে চলুন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট Richar Nixon এর মুখ থেকে এটি সম্পর্কে বিশেষ একটি উক্তি জেনে নেই –

"Anybody can be President of the United States, but very few can ever have any hope of becoming President of the Bohemian Club."

১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি মূলত পুরো বিশ্বের বাছাইকৃত বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত যারা মূলত উচ্চ পর্যায়ের পলিটিক্যাল ও বিজনেস ব্যক্তি ও ইল্যুমিনাটি পরিবারের লোক। বিভিন্ন প্রভাবশালীর সংমিশ্রণে গঠিত এই All male club (কোন নারীকে এই পর্যন্ত সদস্য করা হয়নি) এ রয়েছে হলিউড তারকা, ব্রডওয়ে প্রোডিউসার, বিখ্যাত এন্টারটেইনার, সুরকার ও গায়ক, পেইন্টার, কবি এমন আরও অনেকে যাদেরকে পুরো বিশ্ব "জেন্টেলম্যান" হিসেবে চিনে।

এদের মধ্যে কয়েকজন হল George H. W. Bush (41st US President), George W. Bush (43rd US President), Ronald Reagan (40th US President), Henry Kissinger (American diplomat and political scientist), Tom Johnson (President of CNN), Malcolm Forbes (Publisher of Forbes magazine), Helmut Schmidt (Former Chancellor of Germany), James Baker (Former White House Chief of Staff), Walter Cronkite (CBS board of management), Wally Schirra (Astronaut), Former FBI and CIA directors, International bankers; Heads of big oil companies (ARCO, Mobil,

Pennzoil, Texaco), Mark Twain, Charlie Chaplin এবং এরকম আরও অনেক প্রভাবশালী ফিগার। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০০।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এত জায়গা থাকতে কেন তারা ঐ দুর্গম স্থানে মিটিং করে এই আধুনিক যুগে, তাও আবার এই এলিট মানুষেরা। তারা সেখানে আসলে করেই বা কি ?

সাধারনভাবে মিডিয়াতে যেভাবে তাদের কার্যক্রম প্রচার করা হয় (প্রকৃতপক্ষে এই কার্যক্রম প্রকাশের মাধ্যমে আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়) তা হল এই উচ্চ পর্যায়ের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা জাস্ট দুই সপ্তাহের জন্য সামার ভেকেশনে এসে একত্রে "আনন্দ" করে এবং নিজেদের রিফ্রেশ করতে চায়। এর বাইরে কি তারা কিছুই করে না ? আর করলেও আমরা শয়তানী মিডিয়া থেকে প্রকৃত সত্য আসা করতে পারি না কারন তা করাটা বোকামি।

তারা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রাচীন এক প্যাঁচা আকৃতির পাথরের মূর্তির (৪৫ ফুট দীর্ঘ) সামনে উপাসনা করে। তবে এই প্যাঁচা আকৃতির মূর্তির নিজস্ব ইতিহাস ও অর্থ আছে, যাকে তারা গড বলে মেনে থাকে। তারা এই মূর্তির সামনের বেদীতে (যাকে তারা গড বলে মেনে থাকে) জীবন্ত মানুষ আগুনে পুড়িয়ে "উৎসর্গ" করে (একটু পরেই ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে)। তারা বিশেষ এক রীতিতে তাদের "ধর্মীয় অনুষ্ঠান" পালন করে যার মধ্যে রয়েছে নারীদের পোশাক পরে বিশেষভাবে প্যারেড করা এমনকি তাদের উপর "স্পিরিট" অবতীর্ণ হলে তারা নগ্নও হয়ে যায় ! শুধু তাই নয়, সেখানে বন্য সমকামীতা থেকে শুরু করে এমন অকথ্য অনেক কিছু হয় যা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে কিছু মানুষ মানব চরিত্রের সীমা লঙ্ঘন

করে (তাও আবার আধুনিক আমেরিকার এবং পুরো বিশ্বের জেন্টেলম্যান !!!) এই ধরনের কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছে।

বোহেইমিয়ান গ্রোভে জীবন্ত মানুষ আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ করা হচ্ছে

এসব কিছু কিভাবে এই বোহেইমিয়ানে প্রতি বছর ঘটে ? এই ২৭০০ একরের এলাকাটি মূলত বাহেইমিয়ানদের দখলে আর আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে তারা কোন সাধারন মানুষ না আর এটি কোন সাধারন সমাবেশও না। এটি গোপন সিকিউরিটি ফোর্স কতৃক এমনভাবে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকে যাতে অন্য কোন সাধারন মানুষ এতে প্রবেশ করতে না পারে।

বোহেইমিয়ান গ্রোভের একটি প্রবেশপথে সিক্রেট পুলিশ ফোর্সের পাহারা

বিখ্যাত কন্সপাইরেসি থিওরিস্ট এলেক্স জোন্সের গোপনে ধারণকৃত ডকুমেন্ট Dark Secrets Inside Bohemian Grove (এর শর্ট কাটিং এখান থেকে দেখতে পারবেন) এ এর চাক্ষুষ কিছু দৃশ্য আপনারা দেখতে পারবেন এবং দেখার পর ইন শা আল্লাহ্ অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন। এছাড়া আরও তথ্য পাওয়ার জন্য আপনারা Bohemian Grove: Cult of Conspiracy বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বইটির লেখক মাইক হেনসন। তিনি এবং এলেক্স জোন্স উভয়ই একসাথে অনুপ্রবেশ করেছিলেন বোহেইমিয়ান গ্রোভে এবং পরবর্তীতে তারা আসল তথ্য ফাঁস করে দেন।

আমরা আবার সেই প্যাঁচার ব্যাপারে চলে যাই। এই প্যাঁচা আকৃতির মূর্তির সম্ভাব্য নাম অনেক পাওয়া গেলেও আধুনিক সভ্য জনপ্রিয় এলিটদের (!!??) এই কথিত “গড” কে পাওয়া যায় আমেরিকান ডলারে। ইতিমধ্যে আপনারা পূর্ববর্তী চ্যাপ্টারে আমেরিকান ডলারের একটি ছবি দেখেছেন, যেখানে ডলারের বিভিন্ন সাইন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন স্পেসিফিকভাবে আপনাদের ঐ ডলারের একটি সাইন জুম ইন করে অবস্থায় দেখানো হল :

খুব ছোট আকারে একটি প্যাঁচার ছবি দেখা যাচ্ছে। ডলারের উপর লেখা – “In God We Trust”, একটি প্যাঁচার ছবি সেই ডলারে এবং বোহেইমিয়ান গ্রোভেও সেই প্যাঁচা আকৃতির মূর্তির প্রতি আজব সনাতন শয়তানী উপাসনা – বুদ্ধিমান পাঠকরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন যে তারা কোন “গড” এর কথা বলতে চাচ্ছে।

স্যান ফ্র্যান্সিসকোতে অবস্থিত বোহাইমিয়ান ক্লাবে প্যাঁচার মূর্তি

আরও কিছু ছবি :

আমেরিকার আইনভবনের স্যাটেলাইট ভিউ

আমেরিকার আইনভবনের স্যাটেলাইট ভিউ ভালমত খেয়াল করে দেখুন, এখানে প্যাঁচার আকৃতি দেখা যাচ্ছে আর স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, এটা কোন কারন ছাড়া দুর্ঘটনাবশত করা হয় নি।

বামে – টেক্সাসের অস্টিনে অবস্থিত ফ্রস্ট ব্যাংক বিল্ডিং, ডানে – স্পেনের বার্সেলোনায় অবস্থিত রটুলস রউরা কোম্পানির বিল্ডিং

জাদু বিদ্যার বর্তমান স্বরূপ

ইতিমধ্যে দাজ্জালের বিভিন্ন কারামতি অনেক জাদুকরের মাধ্যমে জাদু হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক জাদুকরকে মাসিয়াহ'র সাথে তুলনা পর্যন্ত করা হয়েছে। কয়েকটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হল - ক্রিস অ্যাঞ্জেল এর লেকের পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, জীবন্ত ব্যক্তির আত্মা মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মৃত ব্যক্তির শ্বাস- প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনা, Luxor Las Vegas এর চুড়োয় নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা, এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং এ বাতাসে ভেসে ভেসে যাওয়া, লোহার গেটের মধ্য দিয়ে হেটে যাওয়া ; ডায়নামোর থেমস নদীতে হেঁটে যাওয়া, ব্রাজিলের Christ the Redeemer স্ট্যাচু এর সামনে "যিশু'র ভঙ্গিমা"য় ভেসে থাকা, ডেভিড কপারফিল্ড - স্ট্যাচু অফ লিবার্টি অদৃশ্য করে ফেলা ইত্যাদি।

ব্রাজিলের Christ the Redeemer স্ট্যাচু এর সামনে "যিশু র ভঙ্গিমা" য় দর্শকদের সামনে ভেসে আছে ডায়নামো

অনেকেই তাদের শূন্যে ভেসে যাওয়া, পানির উপর হাটা ইত্যাদি জাদুগুলোকে জাস্ট ভাঁওতাবাজি বলে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু সত্য কথা হল, কুরআন থেকে জানা যায় যে শয়তান মানুষকে জাদুর পদ্ধতি শিখিয়েছে। সূরা বাকারার ১০২ নাম্বার আয়াতের তাফসিরে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই ব্ল্যাক ম্যাজিকগুলো সত্যিকার অর্থেই অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যার কারনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস চলেও যেতে পারে। আমরা আপাতত এসব ম্যাজিকের কথা চিন্তা করে নিজেদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন করতে পারি।

<u>রায়েলিজমঃ</u>

রায়েলিজম এর প্রতিষ্ঠাতা স্বঘোষিত নাস্তিক Claude Vorilhon দাবী করে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের পিছনে রয়েছে বহিঃজাগতিক বিজ্ঞানীদের হাত, যারা তাকে বর্তমানে দায়িত্ব দিয়েছে মাসিয়াহ হিসেবে। তার কাজ হল মানবজাতিকে "ইলোহিম" এর ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া এবং তাদের স্বাগত জানানোর জন্য দুতাবাস তৈরী করা।

রায়েলিজমকে একটি UFO religion হিসেবে প্রকাশ করানো হলেও কিছু কারনে একে সাদামাটা কোন মতবাদের ন্যায় মনে করা যাচ্ছে না। এর কয়েকটি কারন হল :

(১) Claude Vorilhon এর দাবী অনুযায়ী, ইলোহিমরা তাকে দায়িত্ব দিয়েছে তাদের আগমনের শুভসংবাদের ব্যাপারে, যা Claude Vorilhon তার "চূড়ান্ত বার্তা" বইতে তুলে ধরেছে। এর বাংলা সংস্করনের ১৩৮ পৃষ্ঠায় "ইজরায়েলীদের প্রতি" চ্যাপ্টারে বলা আছে,

"ইজরায়েল রাষ্ট্রকে জেরুজালেমের নিকট অবস্থিত কোনো ভুখন্ডে পরিচালকদের পরিচালকের হাতে দিতেই হবে, যাতে করে তিনি সেখানে নির্মাণ করতে পারেন ইলোহিমের দূতাবাস, তাদের বাসস্থান। সময় আগত হে ইজরায়েলবাসীরা, নব জেরুজালেম যেভাবে ভবিষ্যৎদৃষ্ট হয়েছিলো সেভাবে নির্মাণ করার। ক্লদ রায়েল- ই হলেন সেই জন যার আবির্ভাব বিষয়ে ভবিষৎবাণী করা হয়েছিলো। তোমরা শাস্ত্রাদি পাঠ কর আর চোখ খুলে রাখো।..............

সেখানে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে যদি তোমরা শেষতম পয়গম্বরের কথা শুনে চল, যে পয়গম্বরের আবির্ভাবের ভবিষৎবাণী তোমাদের কাছে করা হয়েছিলো এবং তোমরা তাকে সাহায্য কর আমরা তাকে যে কাজ দিয়েছি তা সুসম্পন্ন করার কাজে।.........নতুবা ইজরায়েল রাষ্ট্রটি আরেকবার ধ্বংস হবে।"

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে তাদের টার্গেট জেরুজালেম।

কিন্তু সেখানে তারা আসবে গড হিসেবে, কিন্তু তারা গড বলতে কি বুঝায় ? চলুন পরের পয়েন্টে।

(২) তাদের ওয়েবসাইটে তারা "কোন জিনিস রায়েলিয়ানদের পৃথক করে গডকে বিশ্বাসকারীদের থেকে ?" - এই ব্যাপারে বলে :

"প্রথমে নির্ধারন করি , 'গড' এর অর্থ কি ? "রেনডম হাউস ওয়েবষ্টার ডিকশনারি" তে গডকে সংগায়িত করা হয়েছে - বিশ্বের এবং শাসক, পরম সত্তা হিসেবে। রায়েলিয়ান হিসেবে আমরা কখনই সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাস করিনা, তাই আমরা নাস্তিক। তাই তখন আমাদের কাছে অনন্ত পৃথিবীর প্রশ্নটি চলে আসে ...."

দাজ্জাল শুধু নিজেকে গড বলে দাবী করবে এমন না, একই সাথে সে পুরো বিশ্ব শাসনও করবে।

(৩) শয়তান ও লুসিফার সম্পর্কে "বহির্জাগতিকদের স্বাগতম" গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় বলা আছে যে শয়তান ছিল ইলোহিমদের গ্রহের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং লুসিফার ছিল ছোট বৈজ্ঞানিক দিলের প্রধান। সুতরাং তারা চাচ্ছে মানুষ যেন শয়তানকে ভাল কিছু মনে করা শুরু করে।

আর তার বাহনের ব্যাপারে UFO এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এটা বুঝার জন্য ও লিঙ্ক করার জন্য আপনারা বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং দাজ্জাল বইটি পরে দেখতে পারেন। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে UFO'র ব্যাপারটি পরিষ্কার করা হয়েছে প্রমাণ সহকারে। আর বর্তমানে সায়েন্স ফিকশনপ্রিয় মানব জাতির সামনে দাজ্জাল UFO করে আসার পর হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী তার অনুসারীদের জন্য দুনিয়াকে জান্নাত বানিয়ে তাদের হার্ট এন্ড মাইন্ড জয় করবে এবং মুমিনরা তাদের জীবনের সর্বোচ্চ ফিতনার মধ্যে দিয়ে যাবে।

দাজ্জালি ষড়যন্ত্র

দাজ্জালি এডভান্স ফোর্সের কার্যক্রম বুঝতে অন্তর চক্ষুর প্রয়োজনীয়তা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) একদিন ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মতের মধ্যে এমন এক জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা রজমকে (ব্যভিচারের দায়ে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার দণ্ডবিধি) অস্বীকার করবে, দাজ্জালের আগমনকে অস্বীকার করবে, কবর আজাবকে অস্বীকার করবে, সুপারিশ অস্বীকার করবে এবং একদল গুনাহগার মুসলমান জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার আকীদাকে অস্বীকার করবে।" (ফাতহুল বারী খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪২৬)

বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইহুদী খ্রিষ্টানদের অর্থে প্রতিপালিত বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের প্রভুদের পরিকল্পনায় নিত্যদিন ইসলামী বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকরা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চলছে এবং ইসলামী চিন্তা চেতনা ও বোধ- বিশ্বাসকে মানুষের জীবন থেকে চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলাম, ইসলামী আইন ও ফতোয়া ইত্যাদি নিয়ে এমনভাবে আলোচনা চলছে, যেন এসব কোন মানুষের তৈরি আইন। হাল আমলে বিভিন্ন দেশের এমন কিছু বুদ্ধিজীবি- চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা বিভিন্ন ব্লগ ও টক শোতে রজম ও অন্যান্য ইসলামী দণ্ডবিধিকে এযুগে অচল সাব্যস্ত করছে। তাছাড়া দাজ্জালের আগমনকে অস্বীকার করার মতো লোকও বর্তমান যুগে বিদ্যমান রয়েছে। ভবিষ্যতে বিষয়টিকে 'বিতর্কিত' বানিয়ে ফেলা হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তা থেকে দূরে সরে যায় এবং অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী প্রভুর সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার কাছে আর প্রকৃত বাস্তবতা ধরা দেয় না। যার কারণে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জাদুতে বস হওয়া চোখসমূহ, প্রিন্ট মিডিয়ার বন্যায় ভেসে যাওয়া বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গদের কাছে নিয়মিত শয়তান উদয় হয়ে অন্তরে কুমন্ত্রণা সরবরাহ করতে থাকে। ফলে তাদের তাদের চিন্তা চেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো শয়তানের আয়ত্তাধীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যাদের চিন্তা- চেতনা অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী সত্তার রঙে রাঙায়িত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করে দেন, চাই তাদের পথগুলো যতই না অন্ধকার, কণ্টকাকীর্ণ ও সংকটাপন্ন করে দেওয়া হোক না কেন।

এটা আজকালের কোন নতুন কথা নয়, বরং মানব ইতিহাস হক্ক ও বাতিলের যুদ্ধসমূহের তাজা সাক্ষী হয়ে আছে। এ যুদ্ধে বাতিলের পাল্লায় ব্যর্থতা এবং পরাজয় ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয়নি, তেমনি বাহ্যিক পরিস্থিতি আর আসবাবপত্রের উপর বিশ্বাসীরা সর্বদায় ধোঁকায় পড়ে আছে।

প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহপাক প্রকাশ্য দুটি চক্ষু প্রদানের পাশাপাশি অন্তরের ভিতরেও দুটি চক্ষু প্রদান করেছেন। প্রকাশ্য চোখদ্বয়ের মাধ্যমে সে বাহ্যিক পরিস্থিতি দেখতে পায়, পক্ষান্তরে অন্তর্চক্ষু ঐ সকল বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রকৃত বাস্তবতাকে পরখ করে ফেলে। এ কারনেই নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া আল্লাম আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আমার চোখে প্রতিটি বস্তুকে তার প্রকৃত চেহারায় দেখার তৌফিক দাও!!!"

প্রকাশ্য চোখদ্বয়ের অন্ধ ব্যক্তি এতটা দয়ার পাত্র নয়; যতটা অন্তরচক্ষু অন্ধ ব্যক্তি। কেননা, আপনি অসংখ্য প্রকাশ্য চোখের অন্ধ ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন যে, সে তার অন্তর চক্ষুর মাধ্যমে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত সফলভাবে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং বাহ্যিক চক্ষুদ্বয় দ্বারা কোন কিছু দৃশ্যমান না হওয়া সত্তেও সে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে শুধুমাত্র এ

উদ্দেশ্য বেঁচে রয়েছে যে, তার মহান প্রভু তো তার যাবতীয় কাজ প্রত্যক্ষ করছেন। পক্ষান্তরে আপনি অসংখ্য প্রকাশ্য চক্ষুস্মান ব্যক্তিদেরকে দেখতে পাবেন যে, সবকিছু দেখা সত্ত্বেও তারা নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয়নি, মানবতা এবং শয়তানীর মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারেনি, মূর্খতা এবং জ্ঞানের মধ্যে তফাত সৃষ্টি করতে পারেনি, কোনটা অন্ধকার কোনটা আলো তারতম্য করতে পারেনি। প্রকাশ্য উজ্জ্বল আলোকিত পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানের পেছনে পেছনে অন্ধকার পথের দিকে যাত্রা করেছে। তাদের মধ্যে আবার অনেক চিন্তাবিদ, প্রশিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, ভাষণদাতা ও উপদেশদাতাকে আপনি দেখতে পাবেন। এদের মধ্যে আবার ভালো- মন্দ যাচাইয়ে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদেরকেও আপনার চোখে পড়বে। এটা শুধুমাত্র এ কারণেই যে, তাদের বাহ্যিক চক্ষুগুলো অক্ষত থাকা সত্ত্বেও অন্তর চক্ষুগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটি বস্তুকে তারা বাহ্যিক রূপ দেখেই বিচার করে ফেলে।

মরুপ্রান্তরে বসবাসকারী এক সম্প্রদায়, আশেপাশে কোন সমুদ্র নেই, যেখানে বন্যা আসারও কোন সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় তাদের কোন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যক্তি যদি বিশালাকারের নৌকা বানানো শুরু করে দেয় আর সর্বসাধারণকে অপেক্ষামান মহাপ্লাবন থেকে সতর্ক করতে থাকে, এহেন পরিস্থিতিতে আপনি আন্দাজ করতে পারেন - অন্তর চক্ষুতে অন্ধ ব্যক্তিবর্গ ঐ ব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ করবে!! এটাই যে, সবাই তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে, পাগল বলে তাকে আখ্যায়িত করবে। এটা কেন? শুধুমাত্র এ কারণেই যে, তাদের মাথায় স্থাপিত দুটি চোখ চারিদিকে শুধু মরুভূমি প্রত্যক্ষ করছে, অদুরে কোন সমুদ্র বা আশেপাশে বড় কোন নদীরও অস্তিত্ব নেই, কখনও কোন প্লাবনের আভাসও সেখানে পাওয়া যায়নি। সমাজের গণ্যমান্য (Elite) ব্যক্তিবর্গও ঐ ব্যক্তির কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং অন্তর চক্ষুতে অন্ধ ব্যক্তি এই নৌকার বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। বিপরীতে ঐ সকল লোক যাদের মন মস্তিস্ক উজ্জ্বল, প্রকাশ্য চোখদ্বয়ের সাথে সাথে অন্তর চক্ষুও সঠিকভাবে পরিচালিত, পাশাপাশি সতর্ককারী ঐ ব্যক্তিটিকেও ভালোভাবে চেনে যে, এক হাজার বছরের জিন্দেগিতে সে কখনও কারও সাথে মিথ্যা বলেনি, কখনও কারও সাথে বেঈমানি করেনি, প্রত্যেকের মঙ্গল কামনাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ সকল ব্যক্তিবর্গ তার কথাকে অবশ্যই সত্য বলে বিশ্বাস করবে - যদিও বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ তার বিপরীতেই থাকুক না কেন!!

সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী যে, অন্তর চক্ষুতে অন্ধ ব্যক্তিবর্গ ঐ মহাপ্লাবনে ভেসে গেছে, এমনকি তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিবর্গ মহাপ্লাবন থেকে রেহাই পেয়ে তারাই পরবর্তীতে বিশ্বময় মানব বংশ বিস্তারের মাধ্যম হয়েছে। তারা হচ্ছে ঐ স্তরের লোক, যারা আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আঃ) এর উপর ঈমান এনে নৌকায় আরোহণ করে ধন্য হয়েছিল। বিপরীতে নিজেদেরকে বড় ভাবা সমাজের গণ্যমান্য চিন্তাবিদ, অধিপতি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞান তাদেরকে রক্ষা করতে পারে নাই। তাদের গবেষণা আর অভিজ্ঞতাগুলো নির্ধারিত প্রতিশ্রুতিকে বিন্দুমাত্র সরাতে পারেনি।

আদ জাতির ইতিহাস লক্ষ্য করুন। এমন এক জাতি, যারা বিল্ডিং নির্মাণ (Architecture & Construction) জ্ঞানে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, তারা পাহাড়ের ভিতরে পাহাড় কেটে কেটে বাড়ি নির্মাণ করত। নিরাপত্তা বিষয়ে তারা এমন ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছিল যে, না আভ্যন্তরীণ কোন শত্রু তাদের উপর ধাওয়া করার শঙ্কা ছিল, না বাইরে থেকে কেউ এসে তাদের উপর চড়াও হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মোটকথা নিজেদের বাসস্থান ও এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা তৈরি করে নিশ্চিন্তে তারা তাদের ঘরবাড়িগুলোতে জীবনযাপন করছিল। এমন সময় যদি তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদের এই সুউচ্চ ও পাহাড়সম ঘরবাড়িগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তবে বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর ভরসাকারী, আকাশসম এ বিশাল অট্টালিকাগুলোর উপর গবেষণাকারী, নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়ালের সাইন্স নিয়ে গবেষণাকারীগণ কথাটিকে কিভাবে বিশ্বাস করে নিবে!!

কিন্তু ইতিহাস এখনও তাদের অন্ধ সাব্যস্ত করেছে। আদ জাতির সার্বিক উন্নয়নশীল, অত্যাধুনিক শক্তি, ভূমিকম্পরোধক এবং সর্বপ্রকার আশংকা থেকে মুক্ত এ সুউচ্চ বিল্ডিংগুলো থাকা সত্ত্বেও তাদের গর্বের অট্টালিকাসমূহকে নিমিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে পরবর্তী লোকদের জন্য এক মহাদৃষ্টান্ত দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক তাদেরকে নিরাপত্তামূলক ঘরবাড়ীগুলোর বাইরে এনেও ধ্বংস করতে পারতেন। কিন্তু এর মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল গবেষক আর বিশেষজ্ঞদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমাদের গবেষণা আর উন্নতি আল্লাহর থেকে পাঠানো বাস্তবতাকে কোন সময় প্রতিহত করতে পারবে না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে নমরুদ চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রজ্জলিত আগুনের বিশাল কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। বাহ্যিক চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ মনে করেছিল যে, আমরা আমাদের প্রভু বিদ্রোহকারী, মূর্তি চূর্ণকারী ইব্রাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করে তার হাড্ডিগুলো পর্যন্ত ছাই বানিয়ে দিয়েছি!!! কিন্তু বাস্তবতা ছিল তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ তা'আলার দুশমন এবং আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ঈসা (আঃ) কে হত্যাকারী ইহুদীরা যখন ঈসা (আঃ) কে কাষ্ঠে চড়িয়ে মনে করেছিল যে, আমরা ইসাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাহ্যিক চক্ষুস্মানগণ এখানেও ধোঁকায় পড়েছিল। এখন পর্যন্ত তারা এই ধোঁকার মাঝেই নিমজ্জিত। কিন্তু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন অন্তরচক্ষুর অধিকারীদেরকে ছয়শত বছর পর ঠিকই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঈসাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়নি; বরং তাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং অন্তরচক্ষুর অধিকারীরা একথায় বিশ্বাস করে নিয়েছে। যদিও পরিস্থিতি তারা সচক্ষে দেখেনি।

সুতরাং আমরা যেন বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলা হিসাবে, আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বুঝতে গিয়ে শুধু পশ্চিমা মিডিয়া ও তাদের দালাল মিডিয়ার তথ্য ও ব্যাখ্যা উপর নির্ভরশীল না হই, আমরা যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের উপর নির্ভর করি যা আমাদের অন্তর চক্ষুকে খুলে দিবে।

ইনশাআল্লাহ, ২০১৪ সালে আল্লাহ বেশ কিছু সত্য উম্মচিত করবেন যা গোটা মুসলিম জাহানকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুনিয়া জানবে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বছরের পর বছর ইসলামের শত্রুরা কি প্রচার করেছে, কি অভিযান চালিয়েছে আর কি ফলাফল এসেছে।

'বিশ্বভ্রাতৃত্ব', 'বিশ্বনিরাপত্তা' ও 'জাতিগত বন্ধুত্ব' – শব্দের আড়ালে দাজ্জালি ষড়যন্ত্র

'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইহুদী ভ্রাতৃত্ব কিংবা তাদের সহযোগী-সমর্থক। ইহুদী বিরোধী কোন জাতি-গোষ্ঠী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আওতাভুক্ত নয়। বরং তারা মানবীয় ভ্রাতৃত্বের বহির্ভূত, যারা কিনা মানবতার জন্য হুমকি। ভিন্ন শব্দে 'আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষ'। তাই যখন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়, "অমুক ভূখণ্ডের বর্তমানের পরিস্থিতিতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব উদ্বিগ্ন", তখন একথার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, এসব অঞ্চলে ইহুদী স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন, সে জন্য ইহুদী ভ্রাতৃত্ব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

'বিশ্ব নিরাপত্তা' এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন একটি জগত, যেখানে ইহুদীদের পরিকল্পনার বিস্তৃততর ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা ও হাইকেলে সুলাইমানির নির্মাণে কোন শক্তি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না। এই নিরাপত্তা অর্জনেরই লক্ষ্যে খোরাসানকে

(বর্তমান আফগানিস্তান) রক্তের সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিরাপত্তার সন্ধানেই ইরাকের নিস্পাপ শিশুদের জীবনগুলোকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সেই শান্তি মিশন, যার গতি এখন ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে মোড় নিয়েছে এবং এখানকার মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে বাধ্য করছে, যেন তারা নিজেদেরকে মূর্তিপূজারীদের সম্মুখে নত করে দিয়ে তাদের আত্মমর্যাদা ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত মূর্তিপূজারীদের উপর ছেড়ে দেয়।

একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, শুধু মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকেই নিরস্ত্র করা হচ্ছে কেন? অথচ ইহুদি/খ্রিস্টান/মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডগুলোকে সবদিক থেকে অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে? উত্তর হল, ইহুদি/খ্রিস্টান/মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডগুলো অস্ত্রসজ্জিত হওয়া 'বিশ্ব নিরাপত্তা' এর জন্য জরুরী আর মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর অস্ত্রসমৃদ্ধ থাকা 'বিশ্বশান্তি' এর জন্য হুমকি।

এছাড়াও আরও বহু পরিভাষা আছে, যেগুলো ইহুদীরা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকে। যেমন- ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি, সন্ত্রাসবাদ, সুবিচার, সমঅধিকার, লিঙ্গবৈষম্য, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব পরিভাষার মর্ম বুঝতে আমাদেরকে ইহুদীদের পরিকল্পনাসমূহ জানতে হবে। অন্যথায়, কিয়ামত পর্যন্ত আমরা শান্তি, নিরাপত্তা ও জাতীয় পরিভাষাসমূহের কান্না কাঁদতেই থাকব।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইহুদী পরিভাষাগুলো না বুঝব, ততক্ষন পর্যন্ত আমাদের বুঝে আসবে না যে, ইহুদী মদদপুষ্ট পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের কাছে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের স্তুপ তৈরি করে চলেছে আর মুসলিম শক্তিগুলোর হাত থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিচ্ছে। পূর্ব তিমুরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা করে খৃষ্টানপ্রধান স্বাধীন ভূখণ্ডে পরিণত করা হচ্ছে আর ফিলিস্তিন কাশ্মীর আরাকানের ক্ষেত্রে ইহুদী আর মূর্তিপূজারীদের মদদ দিচ্ছে। একজন ইহুদীর মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ব মিডিয়া চিৎকার করে উঠছে আর মুসলিম উম্মাহর রক্ত দ্বারা নদী সাগরকে লাল করা হলেও কারও মানবাধিকারের কথা মনে পড়ে না।

'জাতিগত বন্ধুত্ব' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ আস্থা আনিয়ে ভৌগলিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে তোলা। সুতরাং এখন আর তোমার আধুনিক অস্ত্রের কোন দরকার নেই। কাজেই এখন থেকে তুমি তোমার অর্থনীতিতে উন্নতি সাধনের প্রতি মনোনিবেশ করো এবং রাষ্ট্রকে অস্ত্রমুক্ত করে সেনাবাহিনীকে 'পুতুল' বানিয়ে রাখো। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে জাতিগত প্রেম-বন্ধুত্ব আর সাংস্কৃতিক বিনিময়ের রাগ প্রচারের উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমাদের মুসলিম যুবকদেরকে এই সকল অমুসলিমদের চুলের বেণীর বন্দি বানিয়ে দেওয়া।

কোন কোন মুসলিম ভূখণ্ডের তথাকথিত সুশীল সমাজ বলছে, আরব দেশগুলো যখন ইসরাইলকে মেনে নিয়েছে, তখন আমরা কেন ফিলিস্তিনের ব্যাথায় কাতর হব যে, তাদেরকে আমাদের শত্রু বানিয়ে রাখব? এরা দেশের সেই মুনাফিক শ্রেণী, যারা প্রতি যুগে নিজ ভূখণ্ড আর ধর্মের কপালে লাঞ্ছনার তিলক এঁটে দিয়েছে, ডলারের বাজারে নিজেদের মান সম্ভ্রম, আত্মমর্যাদা ও বিবেক বুদ্ধি নিলাম করেছে।

এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ভূখণ্ড ও ধর্মের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষাকে দৃঢ় করার কাজে আরও আন্তরিক ও সচেতন হওয়া দরকার এবং বন্ধু নির্ণয়ের কাজটি নিজ ভূখণ্ড ও ধর্মের স্বার্থকে সামনে রেখে করা দরকার – অন্য কারও স্বার্থকে সামনে রেখে নয়। কারণ, বীরোচিত ইতিহাসের ধারক ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই মুসলিম জাতি সব সময় আপন রব এবং নিজ তরবারিধারী বাহুর উপরই ভরসা রাখে।

স্বাস্থ্যখাত নিয়ে দাজ্জালি চক্রান্ত

স্বাস্থ্যপেশা একটি অতিশয় সম্মানজনক পেশা। কিন্তু এই পেশার দৃষ্টান্ত হল তরবারির মতো। তরবারি যদি আল্লাহভক্ত মানুষের হাতে থাকে, তাহলে সমগ্র মানবতার জন্য রহমতের কাজ দেয় এবং মানবতাকে সমস্ত ক্ষতিকর ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই তরবারি যদি ধর্মহীন ও আল্লাহর শত্রুর হাতে চলে যায়, তা হলে মানবতার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। স্বাস্থ্য পেশাটিও আজ ঠিক অনুরূপ হয়ে গেছে।

কিছু আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্যকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন এগুলো আকাশ থেকে অবতীর্ণ ওহী যে, এই সংস্থাটির কোন কথা ভুল হতে পারে না। অথচ আমরা কখনও কি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এই সব সংস্থার হর্তা কর্তা কারা? এদের ফান্ড কারা জোগাড় দেয়? এর মূল লক্ষ্য কি? মানবতার সেবা, না অন্য কিছু?

এসকল সংস্থা অনেক ক্ষেত্রেই দাজ্জালের জন্য অনেক পথ সুগম করে দিচ্ছে। হাদিসে আছে, যদি কারও উট মরে যায়, তখন দাজ্জাল তার মৃত উটটির মতো একটি উট তৈরি করে দিবে। এই ঘটনাটিকে সে এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখাবে। এটি জাদুর মাধ্যমেও হতে পারে, আবার জেনেটিক ক্লোনিং এর মাধ্যমেও হতে পারে।

যদিও হাদিসে একথার উল্লেখ আছে যে, দাজ্জালের আদেশে শয়তান গ্রাম্য লোকটির পিতামাতার আকৃতিতে এসে হাজির হবে, তথাপি এ বক্তব্যের কারণে জেনেটিক ক্লোনিং পদ্ধতির প্রয়োগকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কারণ, কুরআন ও হাদিসে 'শয়তান' শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেনঃ

"অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু স্থির করেছি - মানুষ শয়তান ও জীন শয়তান।" (সূরা আন'আম,৬ : ১১২)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আবু যর, তুমি মানুষ ও জীন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ কি? উত্তরে আবু যর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, শয়তান কি মানুষের মধ্য থেকেও হয়ে থাকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, মানুষ শয়তানের অনিষ্টতা জীন শয়তানের চেয়ে বেশি হয়।

পশুর ক্লোনিং এ সফলতা পাওয়ার পরে, পাশ্চাত্যের গবেষণাগারগুলোতে মানব ক্লোনিং বিষয়ে নানা রকম গবেষণা চলছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক গবেষণাটি হল এমন একটি মানুষ তৈরি করা, যেটি শক্তিতে অপরাজেয় এবং মেধায় অদ্বিতীয় প্রমাণিত হবে।

এই একই খাতের অপর একটি অধ্যায় হচ্ছে জীবাণু অস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্র। ইহুদীরা ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনের গাজাতে এর ব্যবহার করেছে। অথচ দাজ্জালের সাথে এই ইহুদীদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

"সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের পিছনে থাকবে, যাদের গাঁয়ে তারজানি চাদর জড়ানো থাকবে (তারজানি চাদরও তায়লাসানের মতো সবুজ চাদরকে বলা হয়)। অনন্তর জুমার দিন ফজর নামাজের সময় যখন নামাজের ইকামাত হয়ে যাবে, তখন যেইমাত্র মাহদি মুসল্লিদের পানে তাকাবেন, অমনি তিনি দেখতে পাবেন, ঈসা ইবনে মারিয়ম আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। তার পরিধানে দুটি কাপড় থাকবে। মাথার চুলগুলো এমন চমকদার হবে যে, মনে হবে তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে।"

একথা শুনে আবু হুরায়রা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি তার কাছে যাই, তা হলে আমি তার সঙ্গে মু'আনাকা করব কি? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

"শোনো আবু হুরায়রা, তার এই আগমন প্রথমবারের মতো হবে না। তার সঙ্গে তুমি এমন প্রভাবদীপ্ত অবস্থায় মিলিত হবে, যেমনটি মৃত্যুর ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়। তিনি মানুষকে জান্নাতের মর্যাদা ও স্তরের সুসংবাদ প্রদান করবেন। এবার আমিরুল মুমিনীন তাকে বলবে, আপনি সামনে এগিয়ে আসুন এবং লোকদেরকে নামাজ পড়ান। উত্তরে ঈসা বলবেন, নামাজের ইকামত আপনার জন্য হয়েছে। কাজেই ইমামতও আপনিই করুন। এভাবে ঈসা ইবনে মারিয়াম তার পেছনে নামাজ আদায় করবেন।" (আস- সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১১০)

দাজ্জালের সহচর এই ইহুদীদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে হাদিসে পরিষ্কার বর্ণনা এসেছে :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। মুসলমানরা ইহুদীদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা পাথর ও গাছের আড়ালে লুকাবে। তখন পাথর ও গাছ বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই যে আমার পেছনে এক ইহুদি লুকিয়ে আছে; তুমি এসে ওকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' বলবে না। কেননা, সেটি ইহুদীদের গাছ।" (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৩৯)

ইহুদীদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ জড় পদার্থগুলোকেও বাকশক্তি দান করবেন। তারাও ইহুদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। ইসরাইল যখন গোলান পর্বতমালায় দখল প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন থেকেই তারা ওখানে 'গারকাদ' বৃক্ষ লাগাতে শুরু করেছে। এছাড়াও তারা স্থানে স্থানে এই গাছটি রোপণ করছে। সম্ভবত এই গাছের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে।

এই রাসায়নিক অস্ত্রের সর্বশেষ ব্যবহার করেছে সিরিয়ার বর্তমান শাসক বাশার আল আসাদ গত ২১ শে আগস্ট ২০১৩ সালে। আর সেই রাসায়নিক অস্ত্রটি সে ব্যবহার করেছে দামেস্কের আলগুতা শহরে। উল্লেখ্য রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগকারী এই 'শাসক' যে আরব গোত্রের এবং প্রয়োগের স্থান 'আল গুতা' হাদিসের বর্ণনা হিসাবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণিত "মালহামা" (মহাযুদ্ধ), যে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগ দিয়ে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে "কালব্যিয়া" গোত্র হতে। তার সহচরদের মধ্যেও "কালবিয়্যা" বা "কাল্ব" গোত্রের লোক বেশি হবে। মানুষের রক্ত ঝরানো তাদের বিশেষ অভ্যাসে পরিণত হবে। যে লোকই বিরোধিতা করবে, তাকেই হত্যা করা হবে। এমনকি গর্ভস্থিত সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করবে। শুরুর দিকে তারা ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, পরে যখন শক্তি ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, তারা অত্যাচার-অবিচার ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ প্রথমে তাদেরকে মুসলমানদের মাঝে মহান নেতা বা হিরো হিসাবে উপস্থাপন করা হবে, কিন্তু পরে তাদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যখন হারাম শরীফে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের খবর প্রকাশ পাবে তখন এই শাসক ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে যা মদিনার নিকট বায়দা নামক স্থানে এসে ভূগর্ভে ধ্বসে যাবে। এরপর এই সিরিয়া ও ইরাক হতেই মুজাহিদরা এসে তাঁর নিকট বায়াত হবে। ইমাম মাহদী যখন এই মুজাহিদদের নিয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করবেন, তখন এই শাসকের অন্য এক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ

করবেন এবং তাদেরকে পরাজিত করবেন। এই যুদ্ধটি "কাল্ব যুদ্ধ" নামে হাদিসে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত মাহদী (আঃ) তারবিয়া হ্রদের কাছে এই শাসককে হত্যা করবেন।

১৯৬৬ সালে ক্ষমতায় আসা এই আল আসাদ পরিবারও "কালবিয়্যা" বা "কাল্ব" গোত্রের। তারা শিয়াদের যে শাখার অনুসারী অর্থাৎ "নুসাইরিয়া"/"আলাভি"/ "আলাওয়াতি" রাও "কালবিয়্যা" বা "কাল্ব" গোত্রের। এই আসাদদের অনুগত ও অনুসারী প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর বেশির ভাগই ' নুসাইরিয়া' / ' আলাভি' তথা "কালবিয়্যা" বা "কাল্ব" গোত্রের। ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠের কারণে বেশির ভাগ মুসলিমরা এদেরকে হিরো মনে করে। আজ ক্ষমতায় টিকে থাকতে গিয়ে তাদের আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আজ তারা "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ" দের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত।

রাসায়নিক অস্ত্রের স্বীকার সিরিয়ার দামেস্কের "আল গুতা" নামক স্থানটি রাসূল (সাঃ) এর বর্ণিত "মালহামা" (মহাযুদ্ধে) একটি বড় ভূমিকা রাখবে, যেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন ইমাম মাহদী (আঃ)।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহাযুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাঁবু (ফিল্ড হেডকোয়ার্টার) হবে শামের সর্বোন্নত নগরী দামেস্কের সন্নিকটস্থ আল গুতা নামক স্থানে।" (সুনানে আবি দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১১; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৩২; আল মুগনী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৬৯)

আল গুতা সিরিয়ায় রাজধানী দামেস্ক থেকে পূর্ব দিকে প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল। এখানকার মওসুম সাধারণ উষ্ণ থাকে। তাপমাত্রা জুলাইয়ে সর্বনিম্ন ১৬.৫ এবং সর্বোচ্চ ৪০.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকে। জানুয়ারীতে থাকে সর্বনিম্ন ৯.৩ ডিগ্রী আর সর্বোচ্চ ১৬.৫ ডিগ্রী।

মহাযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দামেস্কের সন্নিকটস্থ আলগুতা নামক স্থানে ইমাম মাহদী (আঃ) এর হাতে থাকবে। যাহোক, এসব বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ইহুদীদের চিন্তা চেতনায় তাদেরই অর্থায়নে মুসলিম দেশগুলোতে স্বাস্থ্যখাতের অধীনে আরেকটি যে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে তা হল 'পরিবার পরিকল্পনা'। এর দ্বারা যত না পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে ব্যভিচার ও অশ্লীলতার প্রসারে।

গোটা দুনিয়াতে মোট ইহুদীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। মূর্তিপূজারী ও খ্রিস্টানদেরকে তাদেরই সতীর্থ এই ইহুদীরা এই পরিবার পরিকল্পনার উপকরণের মাধ্যমে তাদের বংশধারাকে ধ্বংস করিয়েছে। আজ পাশ্চাত্যে মৃত্যুর হারের তুলনায় জন্মের হার কম। তারপর এই পন্থাটি এখন দারিদ্রের ধোঁয়া তুলে মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং হাজার হাজার ডলার ব্যয় করছে।

বর্তমানে মুসলমান ডাক্তারদের কর্তব্য হলো, আপনারা জাতিকে সেই সকল অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করুন, আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে জাতি যার শিকার। যদিও বর্তমানে সময়টি এমন যে, সত্য বললে আগুন আর মিথ্যার সামনে মাথা নত করলে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তথাপি কারও যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে যে, দাজ্জালের সামনে যেটি আগুন হিসাবে পরিদৃশ্য হবে, সেটিই মূলত শীতল পানি হবে, তা হলে মুসলমান ডাক্তারদের সে পথটিই অবলম্বন করা দরকার, যেটি তাদের জন্য উপকারী বলে

বিবেচিত হবে। আমাদেরকে সব সময়ের জন্য স্মরণ রাখতে হবে, সত্য বলার অপরাধে যে আগুন বর্ষিত হয়, এগুলোই আসলে ফুলবাগান। আর মিথ্যার কাছে মাথানত করার কারণে যে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, এগুলোই মূলত আগুন।

দাজ্জাল ও খাদ্য উপকরণ

দাজ্জাল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন একটি পরীক্ষা হবে, যার মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে যাচাই করা হবে, তারা আল্লাহর ওয়াদার উপর কতটুকু বিশ্বাস রাখে। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্য আল্লাহ অনেক মর্যাদা ও প্রতিদান বরাদ্দ রেখেছেন। এ কারণেই দাজ্জালকে সব ধরনের উপকরণ প্রদান করা হবে।

দাজ্জাল সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, তার কাছে বিপুল পরিমাণ খাদ্য উপকরণ থাকবে। সে যাকে ইচ্ছা খাদ্য দিবে, যাকে ইচ্ছা না খাইয়ে মারবে। বর্তমানে পৃথিবীতে বাৎসরিক আয়ের দিক দিয়ে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী সবচেয়ে বড় কোম্পানিটির নাম 'নেসলে'। এই প্রতিষ্ঠানটি ইহুদী মালিকানা এবং এদের মিশন সমগ্র পৃথিবীর খাদ্য উপকরণকে নিজেদের মুঠোয় নেওয়া।

এই কোম্পানিটি বর্তমানে খাদ্য উপকরণ, পানীয়, চকলেট, সবধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য, কফি, গুড়োদুধ, শিশুদের দুধ, পানি, আইসক্রিম, সবধরনের আচার ও স্যুপসহ ২৯ টি ব্র্যান্ডের খাবার। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানিটি সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক প্রসারতা লাভ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এরপরে প্রসারতার ধারাবাহিকতায় এটি আরও পাঁচটি বিশ্বখ্যাত বড় বড় খাবার কোম্পানিকে কিনে নেয়। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী এই কোম্পানির ৮৬ টি দেশে ৪৫০ টি কারখানায় ৩,২৮,০০০ শ্রমিকসহ মোট কর্মী সংখ্যা ৩,৩৯,০০০ জন।

আর এই বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জগত খাদ্য পানীয়র বেলায় নেসলের উপর নির্ভরশীল। আর মুখরোচক রকমারি খাবার মানুষকে অলস বানিয়ে দেয়, শরীরকে স্থূলাকার করে ফেলে আর নানা রোগের জন্ম দেয়। অথচ পরিমিত সাধাসিধে খাবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের সুন্নত। যা আজকাল একমাত্র তাকওয়াপূর্ণ পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রেই যা মেনে চলা সম্ভব।

নু'আইম ইবনে হাম্মাদ সংকলিত 'আলফিতান' -এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে, 'দাজ্জালের সঙ্গে ঝোল ও এমন গোশতের পাহাড় থাকবে, যা কখনো ঠাণ্ডা হবে না'।

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে নানা স্তর অতিক্রম করে খাদ্য ও পানীয় নিরাপদ রাখার জন্য স্বতন্ত্র কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান 'ফুড প্রসেসিং ও প্রিসার্ভেশন' নামে ১৮০৯ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ১৮০৯ সালে নিকোলাস অ্যাপার্ট সর্বপ্রথম খাদ্যের প্রিসার্ভেশন পদ্ধতি আবিস্কার করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজই হল খাদ্য ও পানীয় বস্তুকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করা বিষয়ে গবেষণা করা। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো এ যাবত বহু সংখ্যক পদ্ধতি আবিস্কার করে ফেলেছে। সেই পদ্ধতিগুলোর কিছু পদ্ধতি এমন, যেগুলোতে খাদ্যকে এক বিশেষ মাত্রার তাপে গরম রেখে সংরক্ষণ করা হয়। স্যুপ, আচার, সবজি, গোশত, মাছ ও ডেইরি সংক্রান্ত বস্তুসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গোশতগুলো গরম হবে এবং ঠাণ্ডা হবে না' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ।

প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য আল্লাহপাক মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি ভূখণ্ডে সেখানকার মানুষের মেজাজ,মৌসুম ও ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে নানা প্রকার ফলমূল ও শাকসবজি উৎপন্ন করেন। এসকল বস্তুসামগ্রী সেই দেশের নাগরিকদের মালিকানায় ছিল। নিজেদের ক্ষুধা নিবারণে তারা কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার কথা ছিল না। নিজেদের উৎপাদিত ফসল নিজেরাই ভোগ করত। কিন্তু আল্লাহর শত্রু ইহুদী গোষ্ঠীর বিষয়টি সহ্য হল না। তারা এই সব উৎপাদনকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করল। ঠিক এমন, যেন এই গোষ্ঠীটি আল্লাহর অবতারিত মান্না ও সালওয়ায় সন্তুষ্ট না হয়ে অর্থব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহর নিকট সবজি ও ডালের আবেদন জানিয়েছিল, যাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে নিজেদের দুষ্ট স্বভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে।

আর এর জন্য তারা 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' এর মতো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় এমন আদেশ জারি করিয়ে নিল, যার আওতায় প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীকে বিভিন্ন রিপোর্টে বিভিন্ন অজুহাতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করা হয়েছে। যার ফলে বিশ্ব ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী থেকে দূরে চলে গেছে ও বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল ও স্থানীয় কোম্পানিগুলোর প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে আটা, ময়দা, সুজি, তেল, ঘি, দুধ, জিরা, মরিচ, হলুদ, বিভিন্ন মসলা থেকে শুরু করে রেডি হালিম, রেডি চিকেন কারী, মাটন কারী, রেডি বিরিয়ানি, রেডি খিচুরি, রেডি ক্ষীর মিক্সসহ প্রায় সব ধরনের খাদ্য উপকরণ আজ বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল ও স্থানীয় কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অধীনে বাজারজাতকৃত। অথচ আজ থেকে ১০০ বছর পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, এই সকল প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী খেয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষরা দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন।

তারা তথ্য প্রকাশ করল, মাটির পাত্রে খাবার খাওয়া ক্ষতিকারক। আর যায় কোথায়! অমনি মানুষ সমাজ থেকে মাটির থালা বাসন পাত্রের ব্যবহার তুলে দিল। কিন্তু মজার বিষয় হল, সেই বাসন ফাইভস্টার হোটেলে পৌঁছে গেল আর বলা হল, এগুলোতে খাওয়ার মজাই আলাদা।

তাই বর্তমানে মুসলমান ডাক্তারদের কর্তব্য হল, আপনারা জাতিকে সে সকল অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন, আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে জাতি আজ যার শিকার। যদিও বর্তমানে সময়টি এমন যে, সত্য বললে আগুন আর মিথ্যার সামনে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তবুও কারও যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে যে, দাজ্জালের সময়টিতে যেটি আগুন হিসাবে পরিদৃশ্য হবে, সেটিই মূলত শীতল পানি হবে, তা হলে মুসলমান ডাক্তারদের সেই পথটিই অবলম্বন করা দরকার, যেটি তাদের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হবে। আমাদেরকে সব সময়ের জন্য স্মরণ রাখতে হবে, সত্য বলার অপরাধে যে আগুন বর্ষিত হয়, এগুলোই আসলে ফুলবাগান। আর মিথ্যার সামনে মাথানত করার ফলে যে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, এগুলোই মূলত আগুন।

বানিজ্যখাত নিয়ে দাজ্জালি চক্রান্ত

যে সকল সংস্থা পিছনের দরজা দিয়ে বিশ্বের বানিজ্য ব্যবস্থাকে গুটি কয়েক কর্পোরেশনের অধীনস্থ করার ব্যাপারে তৎপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। এটি হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা বিভিন্ন ভাবে আন্তর্জাতিক বানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে । আন্তর্জাতিক বানিজ্য আইন প্রনয়ন, বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত দন্দ্ব সমাধান, শুল্ক নিয়ন্ত্রন, সকল বানিজ্যের খোজ খবর রাখা ইত্যাদি হলো এই সংস্থার কাজ।

আপাত দৃষ্টিতে এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেশ ভালো। তাদের কথা মতে তাদের উদ্দেশ্য হলো বানিজ্যে বৈষম্যহীনতা, স্বচ্ছতা, প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নয়নশীল দেশ গুলির জন্য সুবিধা সৃষ্টি, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তাদের কার্যক্রম বেশ নেতিবাচক তারা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঠিক উল্টোটাই করে থাকে। নিচে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

যদিও বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা এর সিদ্ধান্ত এই বিশ্বব্যাপী সমাজের সকল স্তরে প্রভাব ফেলে,সারা বিশ্বের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এর কমিটি গঠিত হয়না। কিছু প্রভাবশালী দেশের প্রভাবশালী কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি বৃন্দের মাধ্যমে এর বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। নীতি নির্ধারণী বৈঠক গুলিও গোপনীয় ভাবে সম্পাদিত হয়। এই বিষয়ে তথ্য চাওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা এর কেন্দ্রীয় কমিটি প্রভাবশালী দেশগুলোর আয়ত্তে থাকার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ তেমনভাবে রক্ষিত হয়না। বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত উন্নত দেশগুলির পক্ষেই হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশ গুলি এর ফলে হয় বঞ্চিত। WTO এর বিভিন্ন পলিসি স্থানীয় ছোট ব্যবসা ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু বড় বড় আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন এর জন্য সুবিধা বয়ে আনে।

বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা কর্পোরেশন গুলোর মুনাফা অর্জনকে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উপর অগ্রাধিকার দেয়। তারা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পরিবর্তে তাদেরকে অসম প্রতিযোগিতাতে লিপ্ত হতে বেশি উৎসাহিত করে। তাদের পলিসি অনুযায়ী প্রোডাক্ট উৎপাদন করার সময় যদি শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনও হয় তাহলেও সেটিকে সরকার ধর্তব্যে আনতে পারবেনা প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনই এখানে বেশি অগ্রাধিকার পায় ।

বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা GATS চুক্তির মাধ্যমে জনসাধারনের অত্যাবশ্যকীয় ১৬০ টি পরিসেবা যেমন বৃদ্ধ ও চাইল্ড কেয়ার, সেউএজ ও আবর্জনা নিষ্কাশন, পাবলিক প্রপার্টি রক্ষণাবেক্ষণ, টেলিযোগাযোগ, নির্মাণ, ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, শিপিং, ডাক ইত্যাদি নানাবিধ পরিসেবাকে বেসরকারী করতে চায় । ধনীরা এর মাধ্যমে তেমন প্রভাবিত না হলেও গরিব মানুষ এসব সেবা থেকে বঞ্চিত হয় । ফলে অসমতা সৃষ্টি হয় । এসব পরিসেবা বিদেশী বড় বড় কোম্পানির আয়ত্বে চলে যায় । ফলে জাতীয় সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুক্ষীন হয় ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য নানা ধরনের আইন আছে, কোনো পণ্য উৎপাদন করার সময় সেসব আইন মেনে চলতে হয় যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয় । বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা এসব আইন কে “barriers to trade" বলে অবৈধ ঘোষণা করে । যেমন তারা সর্বপ্রথম "US Clean Air Act" কে অবৈধ ঘোষণা করে । তাদের মতে পণ্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশ বান্ধবতার জন্য যদি কোনো বাধার সৃষ্টি হয় তবে তারা পরিবেশের উপর পণ্য উৎপাদন কে বেশি অগ্রাধিকার দেয় ।

পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশে নানা রকম রোগ বালাই আছে যেমন আফ্রিকায় আছে AIDS এর প্রাদুর্ভাব। এ সত্তেও "Trade Related Intellectual Property" এর নামে এসব দেশে লাইফ সেভিং ড্রাগস্ উৎপাদন করতে তারা বাধার সৃষ্টি করে - যাতে এসব দেশ ওষুধ উন্নত বিশ্ব থেকে কিনতে বাধ্য হয়। এর ফলে এসব ওষুধ হয়ে যায় দুষ্প্রাপ্য ও দামী। ফলে ওষুধের অভাবে প্রতি বছর মারা যায় অসংখ্য মানুষ।

পৃথিবীর ধনী ২০% পৃথিবীর ৮৬% রিসোর্স ব্যবহার করে আর গরিব ৮০% বাকি ১৪% ব্যবহার করে। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা এর কমিটি গুলিতে ধনী দেশ গুলির প্রতিনিধি থাকার ফলে তাদের বিভিন্ন পলিসির মাধ্যমে এই বৈষম্য দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ গুলিকে নিয়ম কানুন, শুল্ক, পলিসি ইত্যাদি নানা ফাদে ফেলে বিভিন্ন ভাবে বাণিজ্য করতে বাধা প্রদান করা হয় ও উন্নত দেশগুলির পণ্য খুব সহজেই ক্রয়-বিক্রয় হয়। ফলে গরিব দেশ গরিবতর হয়, ধনী দেশ হয় আরো ধনী। বিভিন্ন ট্রেড আলাপ-আলোচনা/নেগসিয়েশন কিংবা পলিসি নির্ধারণ রুদ্ধদার বৈঠকের মাধ্যমে হয় - অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশ গুলিকে এইসব বৈঠক জানানো পর্যন্ত হয়না, সিদ্ধান্ত তাদের মাথার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

বিশ্বে যত মানুষ আছে তাদের সকলের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট খাদ্য এই পৃথিবীতে উৎপাদিত হয়। অথচ খাদ্য বন্টনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য পৃথিবীর ৮০০ মিলিয়ন মানুষ তীব্র খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা "Agreement on Agriculture" এর মাধ্যমে এসব কর্পোরেশন কে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেয়।

দাজ্জাল ও সম্পদ কুক্ষিগতকরণ

বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত খনিজ উপাদানের উপর প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক ইহুদীদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত।

আপনি হাদিসে পড়েছেন, দাজ্জালের কাছে সম্পদের অসংখ্য পাহাড় থাকবে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে ইহুদীরা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছে। পৃথিবী থেকে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডকে বিলুপ্ত করে সোনাকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে তারা বিশ্ববাসীর হাতে রং বেরঙয়ের কাগজের টুকরা (কারেন্সি নোট, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি) ধরিয়ে দিয়েছে। এগুলোকে ইহুদী দাসত্বের শিকলে ফেঁসে যাওয়া বিশ্ব নোট কিংবা সম্পদ মনে করে থাকে। তবে এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও ঘোর শীঘ্রই কেটে যাবে। বরং এখন তো মানুষের হাত থেকে নোটও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং হাতে প্লাস্টিকের কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অদূরদর্শী মানুষ প্লাস্টিকের কার্ডটি হাতে নিয়ে নিজেকে কোটিপতি, মিলিয়ন- বিলিয়নপতি ভাবছে।

কম্পিউটারের কীবোর্ডের সামনে বসে হাতের আঙ্গুলের ইশারায় কোটি টাকার হিসাবকারী সেদিন কি করবে, যেদিন কিবোর্ড টিপতে টিপতে আঙ্গুল ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু নিজের অনলাইন একাউন্টের হিসাব মিলবে না? এমন পরিস্থিতির এমন একটা ঝলক গেল কিছুদিন আগে বিশ্ব অর্থমন্দার আলোকে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যেটি ছিল ইহুদী মস্তিস্কের সৃষ্ট ফসল এবং দাজ্জালি শক্তির আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার একটি অংশ। কোন কোন দেশ শেয়ার বাজারের দরপতনের মতো ঘটনায়ও দেখেছেন কিভাবে চোখের সামনে ডিজিটাল স্ক্রিনে কেনা শেয়ারের বিপরীতের মোটমূল্য নামতে থাকে। তাই মুসলমান ব্যবসায়ীদের প্রতি পরামর্শ, আপনারা নিজেদের কাছে রঙ বেরঙ এর কাগজের টুকরো জমানোর পরিবর্তে সোনা রুপা জমান। অন্যথায়, অতিশীঘ্র সমুদয় সম্পদ থেকে হাত ধুয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারেন।

ইহুদীরা ইতিমধ্যেই বড় বড় কোম্পানিগুলোকে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। এখন তারা এর পরের ধাপে চেষ্টা চালাচ্ছে বিভিন্ন শপিং মলের লিমিটেড কম্পানি খুলে বড় বড় শহরগুলোতে দৈনন্দিন বাজারকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এই দুটি প্রতিষ্ঠান সমগ্র পৃথিবীকে বর্তমানে নিজেদের দাস বানিয়ে রেখেছে এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ও গঠনের পরিকল্পনা এখানেই প্রস্তুত হয়। আপনি যদি এই দুই প্রতিষ্ঠানের ঋণ চালু করা এবং পরিশোধ করার পদ্ধতিগুলো গভীরভাবে জানেন, তাহলে দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে অর্থনৈতিক দাস বানাতে হয়, বুঝতে পারবেন।

অপরাপর সম্পদের পাশাপাশি ইহুদীদের দাজ্জালি শক্তি মানবসম্পদের কুক্ষিগতকরণেও পিছিয়ে নাই। তাই তারা তাদের শত্রু মুসলমানদের হয় পঙ্গু বানিয়ে ফেলছে, না হয় নিজেদের নিয়ন্ত্রিত দেশে ডেকে নিয়ে তাদেরকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে। আলেম বলুন আর মুসলমান প্রযুক্তিবিদ বা চিন্তাবিদ বলুন, এমন প্রতিজন মুসলমানের উপর তারা চোখ রাখছে। এদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমানদের মাথা ক্রয় করে নিয়েছে। তৈরি করছে দরবারী আলেম আর মুসলিম নাম সদৃশ ইসলাম বিরোধী চিন্তাবিদ। যাদেরকে ক্রয় করতে পারেনি তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' লেবেল দিয়ে হত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে তারা নিজ দেশের নাগরিকের ক্ষেত্রেও পিছ পা হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশেও সত্যাশ্রয়ী আলেমগণের গণহত্যা এই ধারারই একটি অংশ বিশেষ। যার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আলেমদের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হবে, যেভাবে চোরদেরকে হত্যা করা হয়। আহ, সেদিন আলেমরা নির্বোধের ভান ধরত যদি।" (আস সুনানুল অয়ারিদাতু ফিলফিতান খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৬১; আত তাকরীব খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩১; আল মীযান খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৩৩৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "আমি সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে আলেমদের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তাদের কাছে লাল সোনার চেয়েও মৃত্যু বেশি প্রিয় হবে। তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কবরের কাছে গেলে বলবে, হায়, এর জায়গায় যদি আমি হতাম"। (মুসতাদরাকে হাকেম, পৃষ্ঠা ৮৫৮১)

যদিও উম্মতের এই বিজ্ঞ আলেমদের হত্যাকাণ্ডকে নানা মহল আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করছে । অথচ এই হত্যাকাণ্ডকে হাদিসে রাসুলের আলোকে মূল্যায়িত করা আবশ্যক ছিল।

বর্তমানে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা চূড়ান্ত যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। ইবলিসিয়াত সর্বত্র প্রকাশ্যে নগ্ন নাচ নাচতে চাইছে। মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বোধ বিশ্বাস ও চেতনাকে হৃদয় থেকে মুছে দিয়ে মানুষদের থেকে দাজ্জালিয়াত ও ইহুদিয়াতের "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" এর সম্মতি আদায়ের প্রচেস্টা ও পাঁয়তারা চলছে।

এমতাবস্থায় যারা ইবলিশের ইঙ্গিত ও পরামর্শে কাজ করছে, তারা সত্যের এই সুউচ্চ মিনার ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকগুলোকে সহ্য না করারই কথা, যাদের আঙ্গুলের একটি ইশারায়, কলমের একটি খোঁচায় দাজ্জালের শক্ত প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দিতে সক্ষম। মিথ্যার আতঙ্ক এই আলেমগন এ যুগেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সেই মর্মই বর্ণনা করতে বদ্ধপরিকর, যার ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে সাফা পাহাড়ে।

কাজেই দাজ্জালের ‘এডভান্স ফোর্স’ এদের কি করে সহ্য করতে পারে!

নারী জাতির জন্য দাজ্জালি শক্তির জাল

দাজ্জালি শক্তি মুসলিম নারীদের জন্য ভয়ানক জাল তৈরি করেছে এবং এ জালে শিকারীকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে চমৎকার সব ধ্বনি দিয়ে তা সাজিয়ে রেখেছে। তারা ভালো করেই জানে যে, মুসলিম নারীজাতি যদি এ জালে ফেঁসে যায়, তবে মুসলিম পুরুষজাতিকে পরাজিত করা তাদের জন্য কঠিন কিছু হবে না। কেননা, মুসলিম নারীগণ ইসলামকে রক্ষার জন্য যুগে যুগে বড়ত্ব ও বাহাদুরীর স্বাক্ষর রেখেছে। যেখানেই ইসলামের উন্নতি সাধনে পুরুষগণ প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করেছে, সেখানে নারীগণও কোন অংশে পিছিয়ে রয়নি। এমনটি কখনও হয়নি যে, পুরুষগণ রণাঙ্গন বিজয় করে ফেলেছে সাথে সাথে নারীদের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা সেখানে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং এক সময় তো এমনটি হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষদের সেনাদল একের পর এক পরাজয় বরণ করতে লাগল এবং শত্রুরা মুসলমানদেরকে ধারাবাহিকভাবে পরাভূত করছিল। মুসলিম দেশগুলোকে একের পর এক কাফেররা বিজয় করছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সেখানে না মসজিদ বাকি ছিল না মাদ্রাসা - কাফেররা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। মাদ্রাসাগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উলামাদেরকে জীবিত দাফন করে দেওয়া হয়েছিল। মসজিদগুলোকে মদের আড্ডাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ইসলামী নামকরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। প্রত্যেক মুসলমানকে জোরপূর্বকভাবে মুরতাদ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে পুরুষদের সাহস ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু এমন কঠিন ও নাজুক পরিস্থিতিতেও মুসলিম মহিলাগণ সাহস না হারিয়ে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর তরফ থেকে দেওয়া দায়িত্বসমূহকে পালন করেছিল। তারাই ঘরের আঙ্গিনায় বসে বসে নিভু নিভু করতে থাকা ইসলামের আলোকে জ্বালিয়ে রেখেছিল। সন্তানদের সিনায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কালেমা জীবিত রেখেছিল এবং শিখিয়েছিল যে, তারা মুসলিম জাতি।

দাজ্জালি শক্তি মুসলিম মহিলাদেরকে এ ভয়ানক জালে ফাঁসানোর জন্য একটি বাণী আবিস্কার করেছে যে, মহিলাগণ যদি ঘর থেকে বের না হয়, তবে সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। মনোবৃত্তির পূজারী পুরুষগণ প্রত্যেক যুগেই নারীদেরকে কলঙ্কিত করে আসছে। নারীরা যতই তাদের বাণী, কার্যক্রম এবং ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা রাখবে, ততই তাদের দুঃখ দুর্দশা, কষ্ট ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআন হাদিসে এতকিছু বর্ণিত রয়েছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার নেই।

কিন্তু মডার্ন (দাজ্জালি) সংস্কৃতির জাদু যেহেতু মহামারীর আকার ধারণ করেছে, সেহেতু সমাজের মা ও বোনদের জন্য (যারা পশ্চিমা বিশ্বের দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের বানীগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন) দার্শনিক ও সাহিত্যিক খলিল জিবরানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পেশ করা হলঃ

Modern woman,

Modern civilization has made woman a little wiser, but it has increased her suffering because of man’s covetousness. The woman of yesterday was a happy wife but the woman of today is a miserable mistress. In the past she walked blindly in the light, but now she walks open-eyed in the dark. She was beautiful in her simplicity

and strong in her weakness. Today she has become ugly in her, ingenuity, superficial and heartless in her knowledge" (A Third Treasury of Khalil Gibran, P: 144)

হে প্রিয় মা ও বোনেরা! আপনাদের এবং আপনাদের সন্তানদের ধ্বংসের জন্য দাজ্জালি শক্তি কি কি কার্যক্রম শুরু করেছে, এগুলো একটু লক্ষ্য করুনঃ

"আপনি হয়ত খেয়াল করে থাকবেন, পশ্চিমারা প্রায়শই নানাবিধ অধিকারের নামে বাচ্চাদের কোলে নেওয়া, তাদের লালন পালন করে বড় করা, বাচ্চাদের সাথে পিতামাতার ব্যবহার, মায়ের সুস্থতা, বাচ্চাদের স্বাধীনতা এবং চারিত্রিক ও ধর্মীয় দিক থেকে বাচ্চাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে থাকে। তাদের ভাষ্যমতে, পিতামাতাকে সন্তানের প্রতি কোনরূপ ধর্মীয় বিষয় গ্রহণের জন্য বাধ্য করা ঠিক নয়। পিতামাতার উচিত তার সন্তানকে ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা।

বাচ্চাদের সর্ব বিষয়ের বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন অধ্যায়ন করার স্বাধীনতা থাকা চাই। এমনকি সে যদি অশ্লীল বা যৌন বিষয়ক ম্যাগাজিন ক্রয় করতে চায়, তবে এটাও তার মৌলিক অধিকার। পিতামাতাকে বাচ্চার ব্যক্তিগত বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা চাই। পাশাপাশি অশ্লীলতার এ কাজগুলো যদি সে মুখের দ্বারা বা লেখালেখির দ্বারা প্রচার করতে চায় বা টিভি/ইন্টারনেটের মাধ্যমে বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করতে চায়, তাহলে এসব কাজেও তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

স্বাধীন নিরাপদ যৌনসম্পর্ক, এ বিষয়ে তথ্যাবলী, যোগাযোগ মাধ্যম এবং যৌন শিক্ষা সহজকরণ - এ বিষয়গুলো প্রতিটি উন্নয়নশীল সমাজকে অনুসরণ করতে হবে। নারীগণ তাদের গর্ভ রাখবে না নষ্ট করে দেবে, এটাও তাদের মৌলিক অধিকার। পাশাপাশি এমন অবৈধ সন্তান ও অবিবাহিত নারীদের এমনই সামাজিক অধিকার প্রদান করতে হবে, যেমনটি অন্যদের প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত বিষয়াবলীতে যদি পিতামাতা সন্তানের সাথে জবরদস্তিমূলক কোন আচরণ করে, তবে সন্তানের অভিযোগে পিতামাতাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। অসদাচরণের ক্ষেত্রে মারধর ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষায় সন্তানকে বাধ্য করার বিষয়টি শামিল।"

এ ধারনাগুলো পড়ার পর নিশ্চিতভাবেই মুসলিম বিশ্বের মায়েরা কেঁপে উঠবেন। কিন্তু সারা বিশ্বের কাফের সম্প্রদায় আমাদের ঘরে এমনই পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের ঘরের ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা যে, যেমনভাবে তাদের ঘরগুলোতে অশান্তির আগুন লেগেছে, তেমনি আমাদের ঘরগুলোতেও এ আগুন লেগে যাক।

বর্তমান সময়ে দাজ্জালি শক্তিসমূহের সার্বিক প্রচেষ্টা, দিন রাত মেহনত এবং নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে একটি কথা অবশ্যই বুঝে আসে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বেশি জোর দুটি বিষয়ে -

একঃ মুসলিমভূমিগুলোতে আগ্রাসন। এ বিষয়কে তো সারাবিশ্বের মুজাহিদীনগণ সামলে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ঃ আনেওয়ালা প্রজন্ম। আর এ বিষয়টিতে মুসলিম মহিলাগণ দায়িত্বশীল।

আর তাই তাদের বর্তমান টার্গেটটি হচ্ছে মুসলমানদের ঘরকেন্দ্রিক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এবার কাফেররা তাদের সকল সৈন্যসামন্ত মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে নামিয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম লক্ষ্য হচ্ছে - মুসলমানদের সামাজিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া, যেমনটি ইউরোপ- আমেরিকায় করা হয়েছে।

পশ্চিমা ধাঁচে ফ্যাশন, নারী স্বাধীনতা, পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অঙ্গীকার, ঘরের বাইরে গিয়ে দুনিয়ার হাঙ্গামায় পুরুষদের সাহচর্য প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ঐ সকল ইউরোপ আমেরিকান সভ্যতায় নিমজ্জিত করার মত ব্যাপার, যার মধ্যে একজন মহিলা প্রবেশ করার পর চিরদিনের জন্য সে পুরুষদের খেলনা হয়ে যায়।

আর এগুলোকে পূর্ণতায় রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মা বোনদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে - "ধর্মীয় বিষয়গুলো তো এখন পুরাতন হয়ে গেছে", "বর্তমান আধুনিক যুগে এগুলো অচল" ইত্যাদি। অথচ যেখানে আমাদের এই সব আধুনিক শিক্ষিত মা বোনরাই পারত ধর্মীয় গণ্ডির ভেতরে থেকে যুগোপযুগী দ্বীনের চৌকস খাদেম উপহার দিতে। যারা একদিকে হতো কুরআনে হাফেজ, দ্বীনের আলেম আর অন্যদিকে হতো প্রযুক্তিবিদ।

ইমাম মাহ্দির আগমনের দিনটিকে দাজ্জালি মিডিয়া কেমনভাবে বিশ্বে সংবাদ হিসাবে প্রচার করবে?

কাফেররা মুসলমানদেরকে যে দৃষ্টিভঙ্গির দিকেই নিতে চায়, সারা বিশ্ব ওদিকেই দৌড়ে যেতে শুরু করে। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কোন প্রকার লাভ লোকসান বিবেচনা ছাড়াই হলিউড- বলিউড নায়িকাদের মায়াবী চুলের বন্ধনে বন্দি হয়ে আছে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছে। দাজ্জালি শক্তির বিরুদ্ধের যুদ্ধকে একতরফাভাবে "সন্ত্রাসী যুদ্ধ" বলে মানুষের ব্রেইনে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দাজ্জালি শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে অনেক ভূখণ্ডেই আল্লাহর বান্দারা যুদ্ধ জারি রেখেছেন। বীরত্ব, বাহাদুরি, ধৈর্য এবং আত্মোৎসর্গের এমন এমন ইতিহাস রচনা করে যাচ্ছেন যে, উম্মতের জন্য তা গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু এই মিডিয়া মানুষকে পুরো বিষয়টিকে 'সন্ত্রাস' বলে মোহাচ্ছন করে রেখেছে। একমাত্র আল্লাহ যাকে চান, সেই একমাত্র এর থেকে মুক্ত হতে পারছে। কুফর ও ইসলামের মধ্যকার এ যুদ্ধে মানুষেরা ঐ মতামতটিকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে, যা দাজ্জালি শক্তি এবং তার অনুসারীরা মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গও মিডিয়ার এ বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত নয়। যেমনটি হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেন,

"তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করছি তা হচ্ছে যে, তোমাদের জানা থাকা সত্তেও তোমরা ঐ বস্তুকেই প্রাধান্য দিবে যা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে এবং তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যে তোমরা টেরও পাবে না।" (ইবনে আবী শাইবা, ৭/৫০৩)

বর্তমান সময়ের ঘটনাগুলোকে মিডিয়া যেভাবে পেশ করছে, তা যদি সামনে রাখা হয় - অতপর ইমাম মাহদি এর আবির্ভাবের সময় যখন উলামায়ে দ্বীন এবং মুজাহিদিন কর্তৃক উনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পরিস্থিতিকেও সামনে রাখেন, তবে আন্দাজ করা মুশকিল হয় না যে, মিডিয়া ইমাম মাহদিকে মানুষের সামনে কিভাবে পেশ করবে!! পাশাপাশি মিডিয়াভক্ত লোকেরা ঘটনাটিকে কিভাবে গ্রহণ করবে!!

আসুন আগে আমরা ইমাম মাহদি এর আগমনের বছরের লক্ষণ, আগমনের দিনের ঘটনা, তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণের ঘটনা এবং তাঁর আগমন নিশ্চিত হবার পর তাঁর বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণের ঘটনা সম্বলিত হাদিসগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নেই।

ইমাম মাহদি এর আগমনের বছরের লক্ষণ সেই বছরের রমজান মাস থেকেই প্রকাশ পাবে।

ফিরোজ দায়লামি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে।"

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে?"

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে।"

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনার উম্মতের কারা সেদিন নিরাপদ থাকবে?"

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থানরত থাকবে, সিজদায় লুটিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চ শব্দে আল্লাহু আকবর বলবে। পরে আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিব্রাইল এর, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। ঘটনার পরম্পরা এরূপঃ শব্দ আসবে রমজানে। ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হবে শাওয়ালে। আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে জুলকা'দা মাসে। হাজী লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে জিলজ্জ মাসে। আর মুহাররমের শুরুটা আমার উম্মতের জন্য বিপদ। শেষটা মুক্তি। সেদিন মুসলমান যে বাহনে চড়ে মুক্তি লাভ করবে, সেটি তার কাছে এক লাখ মূল্যের বিনোদন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঘরের চেয়েও বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

অপর এক বর্ণনায় আছে, "... সত্তর হাজার মানুষ ভয়ে পথ হারিয়ে ফেলবে। সত্তর হাজার অন্ধ হয়ে যাবে। সত্তর হাজার বোবা হয়ে যাবে এবং সত্তর হাজার বালিকার যৌনপর্দা ফেটে যাবে।" (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "রমজানে আওয়াজ আসবে। জুলকা'দায় গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে আর জিলহজ্জ মাসে হাজীলুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

হযরত আমর ইবনে শু'আইব এর দাদা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জুলকা'দা মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে দ্বন্দ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ঘটনা ঘটবে। ফলে হজ্জ পালনকারীরা লুণ্ঠিত হবে এবং মিনায় যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সেখানে ব্যাপক প্রানহানির ঘটনা ঘটবে এবং রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। অবশেষে তাদের নেতা (হযরত মাহদী) পালিয়ে রোকন ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যখানে চলে আসবে। তাঁর অনীহা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তাঁকে বলা হবে, আপনি যদি আমাদের থেকে বাইয়াত নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা আপনার ঘাড় উড়িয়ে দিব। বদর যুদ্ধের সংখ্যার সমসংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। সেদিন যারা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে"। (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৪৯)

তাবরানির অপর এক বর্ণনায় আছে, "বাইয়াত গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা হবে বদরী মুজাহিদগণের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ তিনশ তের জন।" (আল মু'জামুল আসওসাত, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭৬)

মুসতাদরাকেরই আরেক বর্ণনায় আছে, হযরত আব্দদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন, "লোকেরা যখন পালিয়ে হযরত মাহদির কাছে আগমন করবে, তখন মাহদি কাবাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবেন। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

আমর (রাঃ) বলেন) আমি যেন তাঁর অশ্রু দেখতে পাচ্ছি। মানুষ হযরত মাহ্দিকে বলবে, আসুন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি। হযরত মাহ্দি বলবেন, আফসোস! তোমরা কত প্রতিশ্রুতিই না ভঙ্গ করেছ! কত রক্তই না ঝরিয়েছ! অবশেষে অনীহা সত্ত্বেও তিনি লোকদের থেকে বাইয়াত নেবেন। (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন) ওহে মানুষ! তোমরা যখন তাঁকে পাবে, তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। কারণ, তিনি দুনিয়াতেও 'মাহ্দি', আসমানেও 'মাহ্দি'।"

ইমাম যুহরি বলেছেন, হযরত মাহ্দির আত্মপ্রকাশের বছর দুজন ঘোষক ঘোষণা করবে। একজন আকাশ থেকে, একজন পৃথিবী থেকে। আকাশের ঘোষক ঘোষণা করবে, লোকসকল! তোমাদের নেতা অমুক ব্যক্তি। আর পৃথিবীর ঘোষক ঘোষণা করবে, ওই ঘোষণাকারী মিথ্যা বলেছে। এক পর্যায়ে পৃথিবীর ঘোষণাকারী যুদ্ধ করবে। এমনকি গাছের ডাল-পাতা রক্তে লাল হয়ে যাবে। সেদিনকার বাহিনীটি সেই বাহিনী, যাকে 'জাইশুল বারাজি' তথা 'জিনওয়ালা বাহিনী' বলা হয়েছে। সেদিন যারা আকাশের ঘোষণায় সাড়া দিবে, তাদের মধ্য থেকে বদরি মুজাহিদগণের সংখ্যার সমসংখ্যক লোক তথা তিনশো তেরজন মুসলমান প্রানে রক্ষা পাবে। অপর বর্ণনায় এসেছে, মারাত্মক যুদ্ধ হবে - শেষ পর্যন্ত হকপন্থিদের মধ্যে শুধু বদর যুদ্ধের সেনাসংখ্যা (৩১৩) পরিমাণ লোক অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা সেখান থেকে ফিরে এসে ইমাম মাহ্দির কাছে এসে বাইয়াত হয়ে যাবে।

হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের ধনভাণ্ডারের নিকট তিনজন খলীফা সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কিন্তু ধনভাণ্ডার তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না। তারপর পূর্ব দিক থেকে কতগুলো কালো পতাকা আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সাথে এমন ঘোরতর লড়াই লড়বে, যেমনটি কোন সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়েনি।"

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, "তারপর আল্লাহর খলীফা মাহ্দির আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা যখনই তাঁকে দেখবে, তাঁর হাতে বাইয়াত নেবে। যদি এজন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে যেতে হয়, তবুও যাবে। সে হবে আল্লাহর খলীফা মাহ্দী।" (সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬৭; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১০)

এখানে 'খলীফা সন্তান' অর্থ সবাই বাদশা বা শাসকের সন্তান হবে। পিতার রাজত্বের দোহাই দিয়ে সবাই ক্ষমতার দাবী করবে। আর 'ধন ভাণ্ডার' দ্বারা কাবা ঘরের নিচের প্রোথিত ধন সম্পদ হতে পারে। আবার নিছক রাজত্বও হতে পারে। কারও মতে, ফোরাত নদীর স্বর্ণ পর্বতকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু রাজত্ব হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ,

উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন মদিনার একজন লোক পালিয়ে মক্কা চলে আসবে (এই আশঙ্কায় যে, পাছে মানুষ আমাকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করে কিনা)। মক্কার লোকেরা তাঁকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুকুন এবং মাকামে ইব্রাহিমের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবে। বাইয়াতের খবর শুনে সিরিয়ার দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা মদিনার মাঝামাঝি বায়দা নামক স্থানে এসে পৌঁছানোর পর এই বাহিনীটিকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে সিরিয়ার 'আবদাল' (শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ) ও ইরাকের 'আসাইব' (সম্মানিত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ) মক্কায় এসে তাঁর (ইমাম মাহ্দীর) নিকট বাইয়াত হবে। অতঃপর সিরিয়ার বনু কালব গোত্রের এক কুরায়শীর আবির্ভাব হবে। সিরিয়ার দিক থেকে সে বাহিনী প্রেরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে পরাস্ত করবেন, যার ফলে তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। এটিই হল 'কালবের যুদ্ধ'। যে ব্যক্তি কালবের

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে, সে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। তাঁরপর তিনি ধনভাণ্ডার খুলে দেবেন, মাল দৌলত বণ্টন করবেন এবং ইসলামকে বিশ্বময় খেলাফতের আদলে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে সাত বছর কিংবা (বলেছেন) নয় বছর।" (আল মু'জামুল আওসাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস ৬৯৪০; ইবনে হিব্বান, হাদিস ৬৭৫৭; আল মু'জামুল কাবীর, হাদিস ৯৩১)

আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আরও আছে, "তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং মানুষ তাঁর জানাজা আদায় করবে।"

ইসলামকে বিশ্বময় খেলাফতের আদলে (কালেমার একক পতাকার ছায়াতলে জাতীয়তাবাদহীন একক ভূখণ্ড) সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি পেছন দিককার শত্রুর সাথে যুদ্ধ, রোমানদের সাথে মহাযুদ্ধ, আন্তাকিয়ার যুদ্ধ, আমকের যুদ্ধ, ফোরাতের তীরে যুদ্ধ, হিন্দুস্তানের (ভারতীয় উপমহাদেশ) যুদ্ধ, কুনুস্তুন্তনিয়া (বর্তমানে তুরস্কের ইস্তাম্বুল) রক্তপাতহীন যুদ্ধসহ অনেক ছোটবড় যুদ্ধ তাঁর খেলাফতকালে অনুষ্ঠিত হবে।

উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কাবা ঘরে আশ্রিত ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনীর আগমন হবে। বায়দার প্রান্তরে পৌছা মাত্র বাহিনীর মধ্যভাগ ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। সম্মুখভাগ পেছন ভাগের সেনাদেরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে। পরক্ষনেই সম্পূর্ণ বাহিনীকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সংবাদ বাহক একজন ছাড়া আর কেউ নিস্তার পাবে না।" (মুসলিম শরীফ)

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন যেন করছিলেন। জাগ্রত হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, এমন কেন করছিলেন হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন,

"খুবই আশ্চর্যের বিষয় - আমার উম্মতের কিছু লোক কাবা ঘরে আশ্রিত কুরায়শী ব্যক্তিকে (ইমাম মাহদী) হত্যার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।"

আমরা বললাম, 'পথে তো অনেক মানুষের সমাগম থাকে!!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। তবে অন্তর ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ পাক তাদের পুনরুত্থান করবেন"। (মুসলিম শরীফ)

উপরের হাদিসগুলো থেকে প্রতিয়মান হয় যে, যে বছর ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে, সে বছরের রমজান থেকেই আলামত প্রকাশ পেতে থাকবে। এবং সেই বছরের মধ্য রমজান হবে শুক্রবার।

২০২৫ সাল পর্যন্ত আগামী বছরগুলোতে মধ্য রমজান শুক্রবার হবার সম্ভাবনা যে সালগুলোতে সেগুলো হল, ২০১৪ সালের ১১ ও ১২ ই জুলাই (১৪৩৫ হিজরির ১৪ ও ১৫ ই রমজান শুক্রবার ও শনিবার), ২০১৫ সালের ২ ও ৩ জুলাই (১৪৩৬ হিজরির ১৫ ও ১৬ ই রমজান বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার), ২০১৭ সালের ৯ ও ১০ ই জুন (১৪৩৮ হিজরির ১৪ ও ১৫ ই রমজান শুক্রবার ও শনিবার), ২০২০ সালের ৮ই মে (১৪৪১ হিজরির ১৫ ই রমজান শুক্রবার), ২০২২ সালের ১৫ ও ১৬ ই এপ্রিল (১৪৪৩ হিজরির ১৪ ও ১৫ ই রমজান শুক্রবার ও শনিবার), ২০২৩ সালের ৬ ও ৭ ই এপ্রিল (১৪৪৪ হিজরির ১৫ ও ১৬ ই রমজান বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) এবং ২০২৫ সালের ১৪ ও ১৫ ই মার্চ (১৪৪৬ হিজরির ১৪ ও ১৫ ই রমজান শুক্রবার ও শনিবার)।

চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে এবং ২৯ বা ৩০ দিনে রমজান মাস হবার উপর ভিত্তি করে মধ্য রমজান শুক্রবার হিসাবে সাব্যস্ত হবে।

'প্রথম শব্দটি হবে জিব্রাইল এর, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের' দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম শব্দটি আকাশ থেকে আসবে আল্লাহর নির্দেশে। কিন্তু যেহেতু এই শব্দের প্রভাব দুনিয়ার সতর্ক মুমিনদের চোখ খুলে দিবে এবং তাই কাফিররা প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় এমন বিকট কোন শব্দ ঘটাবে, যাকে 'শয়তানের শব্দ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবং এই শব্দকে একটি প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনা বলে দাজ্জালি মিডিয়াতে এমনভাবে রং লাগিয়ে প্রকাশ করা হবে, যাতে দুনিয়ার সবাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় এবং অপেক্ষাকৃত উদাসীন, শেষ জামানার আলামত সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা সহজেই পথ ভ্রষ্ট হয়।

'জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করে বিরোধ সৃষ্টি', 'তিনজন খলীফা সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে' এবং এ সময় ইমাম মাহদীর 'মদিনা থেকে মক্কায় চলে আসা' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, মৃত্যুবরণকারী খলীফা কোন এক সৌদি শাসক হবেন, যার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিসিক্তি নিয়ে মতবিরোধ ঘটবে। বর্তমানে সৌদি রাজ পরিবারের কাছে রাজত্বের পাশাপাশি মক্কা - মদিনার দায়িত্বপ্রাপ্তি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সৌদি বাদশারা তাদের নামের সাথে তাদের মক্কা – মদিনার সংশ্লিষ্টতাও লিখে থাকেন। যেমন বর্তমান বাদশা তাঁর নাম সরকারীভাবে এভাবে লিখেনঃ King Abdullah Bin Abdul Aziz al Saud, Kingdom of Saudi Arabia & custodian of two holy mosques.

বর্তমান বাদশার বয়স ৮৯ বছর। সৌদি রাজ পরিবারের ব্যাপারে সেখানকার সাধারণ জনগণের অসন্তোষ, তাঁর ভবিষ্যৎ মৃত্যু এবং মধ্য প্রাচ্যের বর্তমান অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রও পিছিয়ে নাই। গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে 'নিউইয়র্ক টাইমস' একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছাপে যার শিরোনাম 'How 5 countries in middle east could become 14'। সেখানে তারা বেছে নিয়েছে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন ও সৌদি আরব। (এর ভিতরে ৩ টি ভূখণ্ডের সংশ্লিষ্টতা আছে ইমাম মাহদীর আগমনের দিন, আমরা হাদিস থেকে জেনেছি, সিরিয়ার 'আবদাল' বা শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ ও ইরাকের 'আসাইব' বা সম্মানিত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ মক্কায় এসে ইমাম মাহদীর নিকট বাইয়াত হবে)। আর সৌদি আরবকে ভাঙ্গার সম্ভাব্য কারণ দেখিয়েছেঃ

'Saudi Arabia faces its own (suppressed) internal divisions that could surface as power shifts to the next generation of princes. The kingdom's unity is further threatened by tribal differences, the Sunni-Shiite divide and economic challenges'.

হাদিসেও এসেছে "গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে জুলকা'দা মাসে"। আর সব মিলিয়ে যদি সত্যিই পশ্চিমারা অদূর ভবিষ্যতে এর সুযোগ নিতে চায়, স্বভাবতই সবচেয়ে বড় যেই বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে তা হলঃ "মক্কা - মদিনার দায়িত্বপ্রাপ্তি" বা custodian of two holy mosques.

হাদিসে উল্লেখ আছে, 'বাইয়াতের খবর শুনে সিরিয়ার দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে'। এর অর্থ হল ইসলামের শত্রুরা হযরত মাহদীর অপেক্ষায় থাকবে এবং গোয়েন্দা মারফত হারাম শরীফের খবর নিতে থাকবে। হারাম শরীফের সিরিয়ার দিক থেকে বর্তমান সিরিয়া ব্যতীত যে ভূখণ্ডটি আছে তা হল জর্ডান (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর সময়ে এটি তৎকালীন শাম অর্থাৎ বৃহত্তর সিরিয়ার অংশ ছিল)। যেহেতু সিরিয়া থেকে বনু কালব গোত্রের এক কুরায়শী দ্বিতীয় বাহিনী প্রেরণ করবে, তাতে আন্দাজ করা যায়, এই বাহিনীটি আসবে জর্ডান থেকে। এবং তা

কিভাবে হবে, এটি বুঝতে হলে বর্তমান জর্ডানের সামরিক কার্যকলাপের দিকে নজর দিতে হবে। সিরিয়াতে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে উপলক্ষ্য করে একে আঞ্চলিক শান্তির জন্য হুমকি স্বরূপ দেখিয়ে জর্ডান সরকার ২০১৩ এর প্রথমার্ধে ৯০০ মার্কিন সৈন্যকে থাকার অনুমতি দেয়। এবং মার্কিন সামরিক সচিব টাইমস পত্রিকাকে এপ্রিলে জানায়, এটি যে কোন সময় বাড়িয়ে ২০,০০০ পর্যন্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই যদি হয়, বর্তমান অবস্থা, তাহলে যখন সৌদি আরবে গোত্রগুলোর বিদ্রোহের কারণে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তখন এই জর্ডানের সরকারী বাহিনী তাদের মিত্র কাফের বাহিনীকে নিয়ে নিজ গদি ঠেকাতে কি পদক্ষেপ নিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

হাদিসে আরও বলা হয়েছে, পুরো বাহিনীটিকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে এবং "সংবাদ বাহক একজন ছাড়া আর কেউ নিস্তার পাবে না।" এরূপ এক আজাবের সাক্ষীকে স্বভাবতই গায়েব/হত্যা করা হবে এবং কখনোই তা প্রকাশ করতে দেওয়া হবে না।

হাদিসে আরও উল্লেখ আছে, "অতঃপর সিরিয়ার বনু কালব গোত্রের এক কুরায়শীর আবির্ভাব হবে। সিরিয়ার দিক থেকে সে বাহিনী প্রেরণ করবে।" এর অর্থ হল, সে সময় বনু কালবও সিরিয়া শাসন করবে ও তারা ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকবে।

কোন কোন হাদিসে এই শাসককে 'সুফিয়ানি' হিসাবে অবিহিত করা হয়েছে। এর কারণ, হিসাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "সুফিয়ানি - যে লোক শেষ যুগে সিরিয়াতে দখল প্রতিষ্ঠা করবে সে বংশগতভাবে খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের বংসদ্ভুত হবে। তার সহচরদের মধ্যেও "কালব্যিয়া" বা "কাল্ব" গোত্রের লোক বেশি হবে। মানুষের রক্ত ঝরানো তাদের বিশেষ অভ্যাসে পরিণত হবে। যে লোকই বিরোধিতা করবে, তাকেই হত্যা করা হবে। এমনকি গর্ভস্থিত সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করবে। যখন হারাম শরীফে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের খবর প্রকাশ পাবে তখন এই শাসক ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে।" (মাজাহিরে হক জাদিদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৩)

"শুরুর দিকে তারা ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, পরে যখন শক্তি ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, তারা অত্যাচার- অবিচার ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে।" (ফয়জুল কদির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৮)

অর্থাৎ প্রথমে তাদেরকে মুসলমানদের মাঝে মহান নেতা বা হিরো হিসাবে উপস্থাপন করা হবে, কিন্তু পরে তাদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

"প্রথম বাহিনী বায়দায় ধ্বসে যাওয়ার পর ইমাম মাহদী মুজাহিদদের নিয়ে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে যাবেন, সেখানে অন্য এক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে পরাজিত করবেন। এই যুদ্ধটি "কাল্ব যুদ্ধ" নামে হাদিসে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বাহিনীর নেতার উপাধি 'সুফিয়ানি' (বনু কালব গোত্রের এক কুরায়শী)। হযরত মাহদী (আঃ) তারবিয়া হ্রদের কাছে এই শাসককে হত্যা করবেন।" (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

মুসলিম বিশ্বের জন্য উদ্বিগ্নের বিষয় হল, ১৯৬৬ সালে সামরিক ক্যু এর মাধ্যমে সিরিয়ার ক্ষমতা দখলকারী আল আসাদ পরিবারও "কালব্যিয়া" বা "কাল্ব" গোত্রের। তারা শিয়াদের যে শাখার অনুসারী অর্থাৎ "নুসাইরিয়া"/ "আলাভি"/ "আলাওয়াতি" রাও "কালব্যিয়া" বা "কাল্ব" গোত্রের। এই আসাদদের অনুগত ও অনুসারী প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর বেশির ভাগই "নুসাইরিয়া"/ "আলাভি" তথা "কালব্যিয়া" বা "কাল্ব" গোত্রের। ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠের কারণে বেশির ভাগ মুসলিমরা এই পরিবারকে হিরো মনে করে। আজ ক্ষমতায় টিকে

থাকতে গিয়ে তাদের আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আজ তারা “আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ”দের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। প্রথম শাসক ছিল হাফিজ আল আসাদ, তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় শাসক বাশার আল আসাদ। কিন্তু আরবদের বিভিন্ন পশ্চিমা দালাল মিডিয়াতে নিজের "কালবিয়্যা" বা "কাল্ব" গোত্রের পরিচয়কে গোপন করে কুরাইশ বংশের পরিচয়কে বাশার আল আসাদ বার বার সামনে আনছে (হাদিসে এসেছে কালব গোত্রের কুরায়েশী ব্যক্তি) এবং রাসুল (সাঃ) এর কুরাইশ বংশের ধোঁয়া তুলে বর্তমান মুসলিম জাহানের অপেক্ষাকৃত উদাসীন, শেষ জামানার আলামত সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের সহজেই পথ ভ্রষ্ট করছে।

এমনকি সিরিয়ার এই বনু কালব গোত্রীয় শাসক বাশার আল আসাদ গত ২১ শে আগস্ট ২০১৩ সালে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে দামেস্কের আল গুতা শহরে। এই ‘আল গুতা’ হাদিসের বর্ণনা হিসাবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারণ, সিরিয়ার দামেস্কের “আল গুতা" নামক স্থানটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণিত "মালহামা" (মহাযুদ্ধে) একটি বড় ভূমিকা রাখবে, যেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন ইমাম মাহদী।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মহাযুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাঁবু (ফিল্ড হেডকোয়ার্টার) হবে সিরিয়ার সর্বোন্নত নগরী দামেস্কের সন্নিকটস্থ আল গুতা নামক স্থানে।” (সুনানে আবি দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১১;   মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৩২;   আল মুগনী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৬৯)

আল গুতা সিরিয়ায় রাজধানী দামেস্ক থেকে পূর্ব দিকে প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল। মহাযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দামেস্কের সন্নিকটস্থ আল গুতা নামক স্থানে ইমাম মাহদী এর হাতে থাকবে।

সমস্ত দাজ্জালি মিডিয়া এই রাসায়নিক অস্ত্রের বিষয়টিকে এমনই বিতর্কিত করে তুলেছে যে, আল গুতা তো দূরের কথা, রাসায়নিক অস্ত্র আদৌ বাশার আল আসাদ এর বাহিনী মেরেছে কিনা সেটাই এখন ধোঁয়াশা হয়ে গেছে। আর এই বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদকে তো ইতিমধ্যেই পশ্চিমা দাজ্জালি মিডিয়া এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের দালাল মিডিয়া একে “যৌন জিহাদ” বলে অপপ্রচার করে অপেক্ষাকৃত উদাসীন, শেষ জামানার আলামত সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের পথ ভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালিয়েছে।

হাদিসে মিনায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটবে বলা হয়েছে। এত বড় একটি ঘটনা হঠাৎ ঘটে যাবে না। বরং ইসলামের শত্রু কাফেররা (ইহুদী খৃষ্টান ও মূর্তিপূজারীরা) আগে থেকেই এর প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে এবং তাদের অনুগত দাজ্জালি মিডিয়ার দ্বারা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অপপ্রচারটিই চালাবে। মিডিয়ার স্ক্রলে ব্রেকিং নিউজ হবে হয়তোঃ “হজ্জ চলাকালীন মুসলমানদের উপর মক্কা শরীফে সন্ত্রাসী হামলা।” তাদের অপপ্রচারের নমুনাটি নিম্নরূপ হতে পারেঃ

খবর পাঠকঃ আমরা এই মাত্র খবর পেলাম হজ্জ চলাকালীন মুসলমানদের উপর মক্কা শরীফে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে আমরা সেখানে আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ (অথবা একটি আরব মুসলিম নাম) এর সাথে সরাসরি কথা বলব।.... হ্যালো, আবদুল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন?

আবদুল্লাহঃ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

খবর পাঠকঃ মিনাতে ঠিক কি হচ্ছে এবং কারা এই হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে?

আবদুল্লাহঃ মক্কার মিনা প্রান্তরে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছে......। ওখানে ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে...। হাঙ্গামার কারণ এখনও অজানা...। কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে, এর পিছনে ঐ সকল সন্ত্রাসীরাই জড়িত, যারা

ইতিপূর্বে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরিয়ে আসছে ... এবং ধর্মীয় স্থানগুলোতে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আসছে। মিনা প্রান্তরে অসংখ্য হাজীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। লাশগুলো রক্তের বন্যায় ভাসছে। আমি যে সকল জীবিতদের সাথে কথা বলেছি, তাদেরকে অনেকেরই হজ্জের সামানা লুণ্ঠিত হয়েছে।

খবর পাঠকঃ আব্দুল্লাহ, কাবা শরীফের এই মুহুর্তে ঠিক কি অবস্থা?

আবদুল্লাহঃ উপস্থিত সন্ত্রাসীরা আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বা শরীফ দখল করে নিয়েছে এবং কা'বা শরীফের আশেপাশের হাজীদেরকে বন্দি করে ফেলেছে। সন্ত্রাসীরা এই হাজীদেরকে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। বন্দিদের মধ্যে ছোট ছোট শিশু এবং অজস্র নারী বিদ্যমান। চারপাশ থেকে চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। সাহায্যের জন্য শিশুরা চিৎকার করে আহ্বান করছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই সকল সন্ত্রাসীদের মধ্যে মার্কিনবিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীও বিদ্যমান...... যাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য আগে থেকেই অপারেশন জারি ছিল...... সন্ত্রাসীদের ধর্ম বলে কিছু নেই। ধারণা করা হচ্ছে, এই সন্ত্রাসীদের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩৫০ এর মতো হবে। (ইমাম মাহদীর আগমন ও ৩১৩ জনের বাইয়াত গ্রহণের ঘটনা আড়াল ও সন্ত্রাসী বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া)।

সংবাদ পাঠকঃ আবদুল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা আবার আপনার সাথে পরে যোগাযোগ করব। এইমাত্র আমাদের হাতে খবর এসে পৌঁছেছে যে, মক্কা শরীফকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জর্ডান ও মার্কিন সেনাদের নিয়ে গঠিত শান্তিরক্ষা বাহিনী যাত্রা শুরু করেছে। (তবে জোটবদ্ধ এই বাহিনীর পরিণামে কি হয়েছে, তা গোপন করা হবে)।

ইমাম মাহদীর দলকে ধ্বংস করতে যাওয়া বাহিনীর বায়দা প্রান্তরে মাটির নিচে ধ্বসে যাওয়ার যে কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সে পরিস্থিতি নিয়ে মিডিয়ার মিথ্যা, বানোয়াট, ধোঁকা এবং জাদুময়ী অপপ্রচারের আন্দাজ আপনি করতে পারেন।

সারা বিশ্বের জনসাধারণকে মিনার প্রান্তরের বিভিন্ন লাশের ছবি বার বার বিভিন্ন চ্যানেলে টিভি স্ক্রিনে দেখানো হবে আর ইমাম মাহদীকে পুরো ঘটনার জন্য দায়ী করে 'স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চলতে থাকবে। আর সাথে থাকবে সুন্নতি লেবাসধারী সরকারী/দরবারি আলেমদের কুরআন হাদিসের আলোকে পুরো ঘটনার অপব্যাখ্যাওয়ালা টক শো।

আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, বিভিন্ন ভূখণ্ডে কিভাবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যা দিয়ে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে দাজ্জালি মিডিয়ার মাধ্যমে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে সাধারণ মানুষের ব্রেইন ওয়াশ করা হয়েছে। আর এটি তো আরও অনেক বড় ব্যাপার। মিডিয়ার চালে চলমান এমন অপেক্ষাকৃত উদাসীন, শেষ জামানার আলামত সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের মুসলমান নামধারীরা সেদিন ইমাম মাহদীর কথা মানা তো দূরের কথা, এদের মুখ থেকে কি ধরনের সব প্রতিক্রিয়া বের হতে থাকবে ...... এর আন্দাজ করা কঠিন নয়।

পক্ষান্তরে ঐ সকল ব্যক্তি যারা বিবিসি/সিএনএন এর মতো পশ্চিমা দাজ্জালি মিডিয়া ও তাদের বিভিন্ন ভাষাভাষী দালাল মিডিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সত্যকে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কাউকে ভয় করে না, কারও সাথে আপোষ করে না, যাদের অন্তর সদা হক্ক গ্রহণে উন্মুখ - তারা যদি পাহাড়ের গর্তেও অবস্থান করে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের জ্ঞান তাদের ঠিকই হয়ে যাবে।

যেহেতু "রিসালাত আল খুরুজ আল মাহাদি" কিতাবের ১০৮ পৃষ্ঠায় এসেছে, "১৪০০ হিজরির পরে মানুষ ইমাম মাহদীকে ঘিরে একত্রিত হবে" (এটি হাদিস নয়, কিতাবটিও কোন সনামধন্য কিতাব নয়, সতর্কতার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে)

আর “আসমাল মাসালিক লিয়্যাম মাহাদিয়্যা মালিকি লি কুল্লু-ইদ দুনিয়া বি ইম্রিল্লাহিল মালিক” কিতাবে কালদা বিন জায়েদ ২১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেনঃ “১৪০০ হিজরির সাথে আরও বিশ বা ত্রিশ বছর যোগ কর। এরপরে কোন এক সময়ে মাহদীর আবির্ভাব হবে…”। (এটি হাদিস নয়, কিতাবটিও কোন সনামধন্য কিতাব নয়, সতর্কতার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে)

তাই বর্তমান ১৪৩৫ হিজরিতে এসে সামনের দিনগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তার উপর উপর সিরিয়াতে বনু কালব গোত্রের দ্বিতীয় শাসক (দ্বিতীয় সুফিয়ানি) এবং তার বর্তমান কার্যক্রম।

হযরত আরতাত (রাঃ) বলেন, “দ্বিতীয় সুফিয়ানির জামানায় বিকট এক আওয়াজ আসবে। আওয়াজটি এতই বিকট হবে যে, প্রত্যেক গোত্রই মনে করবে - তাদের নিকটবর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে।” (আল ফিতান, ৮৫০)

তাই, কোন উপসংহারে না পৌঁছালেও বিশ্বাসী বান্দা হিসাবে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে হাদিসে বর্ণিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বোপরি সামরিক পরিস্থিতির উপর।

দাজ্জালের মহাযুদ্ধ ও তাকে হত্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের মহাযুদ্ধ পাঁচটি। তার দুটি ইতিপূর্বে এই উম্মতের আগে বিগত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি এই উম্মতের মাঝে সংঘটিত হবে। একটি হল তুর্কি মহাযুদ্ধ। একটি রোমানদের (খ্রিস্টিয়ানদের) সঙ্গে মহাযুদ্ধ। আর তৃতীয়টি হল, দাজ্জালের মহাযুদ্ধ। দাজ্জালের পর আর কোন মহাযুদ্ধ হবে না"। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪৮, আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একটি পক্ষের নেতৃত্বে ছিল ইসলামী খেলাফতের সর্বশেষ কর্ণধার তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাদের পরাজয়ের পর, ঈমানের দুর্বলতা আর ইহুদী খ্রিষ্টানদের উস্কে দেওয়া আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানের কারণে ১৯২৪ সালে তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীন খেলাফত শাসনের বিলুপ্তির মাধ্যমে মুসলমানদের ইসলামী শাসননীতি খেলাফতের যা অবশিষ্ট ছিল তারও বিলুপ্তি ঘটে। কুস্তুন্তুনিয়া বা ইস্তাম্বুলের ভূমি থেকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তথা ইসলামের পরাজয় ঘটে। কামাল পাশার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কট্টর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ নামক কুফরি মতবাদের জয় হয়, যা এখনও বিদ্যমান।

রোমানদের (খ্রিস্টানদের) সঙ্গে এই উম্মতের যে মহাযুদ্ধ হবে তার নেতৃত্ব দিবেন ইমাম মেহেদী। আর দাজ্জালের সাথে যে মহাযুদ্ধ হবে তার নেতৃত্ব দিবেন ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ)।

যদিও মুসলিম জাতি নিজেদের অলসতা ও অবহেলার কারণে আগত এক অনিবার্য বাস্তবতার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে না, তবে কুফরি শক্তি ঠিকই এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

হযরত আবু জায়িরা বর্ণনায় বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট দাজ্জালের আলোচনা উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, "তার আবির্ভাবের সময় মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল তার অনুগামী হয়ে যাবে। একদল অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে পরিজনের সাথে ঘরে বসে থাকবে। একদল এই ফোরাতের তীরে এসে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাজ্জাল তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর তারা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি তারা শামের (সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, প্যালেস্টাইন ও দখলকৃত প্যালেস্টাইন নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল) পশ্চিমাঞ্চলে লড়াই করবে। তারা একটি সেনা ইউনিট প্রেরণ করবে, যাদের মাঝে চিত্রা বা ডোরা বর্ণের ঘোড়া থাকবে। এরা ওখানে যুদ্ধ করবে। ফল এই দাঁড়াবে যে, এদের একজনও ফিরে আসবে না"। (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৪১)

হযরত নাফে' ইবনে উকবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার অবর্তমানে তোমরা তোমরা জাজিরাতুল আরবে যুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহ এই অঞ্চলটিকে বিজিত করবেন। তারপর তোমরা পারস্যে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাকেও বিজিত করবেন। তারপর তোমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাকেও বিজিত করবেন। তারপর তোমরা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাকেও বিজিত করবেন"। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২২৫; সহিহ ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা ৬৬৭২)

হযরত নাহীক ইবনে সারীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা উর্দুন

(জর্ডান) নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে।” (আল ইসাবা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৭৬)

এখানে মুশরিকদের দ্বারা উদ্দেশ্য উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী জাতি। তার মানে এটি সেই যুদ্ধ - “গাজওয়াতুল হিন্দ”, যেখানে মুজাহিদরা এই উপমহাদেশে আক্রমণ চালাবে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন, ক্ষমা করে দেবেন, বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা জেরুজালেমে ফিরে যাবে এবং সেখানে ঈসা (আঃ) সাক্ষাত পাবে এবং ঈসা (আঃ) নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২; আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯ ও ৪১০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন, “সমুদ্রের শহীদান, আন্তাকিয়ার-আমাকের শহীদান ও দাজ্জালের শহীদান হল মহান আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠতম শহীদ”। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৯৩)

এসব যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে এক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, “উক্ত যুদ্ধে যে এক তৃতীয়াংশ লোক শহীদ হবে, তাদের এক একজন বদরি শহীদদের দশজনের সমান হবে। বদরের শহীদদের একজন সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে। পক্ষান্তরে এই ভয়াবহ যুদ্ধগুলোর একজন শহীদ সাতশো ব্যক্তির সুপারিশের অধিকার লাভ করবে।” (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৯)

তবে মনে রাখতে হবে, এটি একটি শানগত মর্যাদা। অন্যথায় মোটের উপর বদরি শহীদদের মর্যাদা ইতিহাসের সকল শহীদের মাঝে সবচেয়ে উঁচু।

রোমানদের (খ্রিস্টানদের) সঙ্গে এই উম্মতের যে মহাযুদ্ধ হবে তার নেতৃত্ব দিবেন ইমাম মেহেদী। এই মহাযুদ্ধের বিজয়ের পর তিনি আবারও নবুয়্যতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন যার আমিরুল মুমিনিন হবেন তিনি নিজেই। আর এই মহাযুদ্ধের বিজয় কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের কারণ হবে। আর কুস্তুন্তুনিয়ার (ইস্তাম্বুলের) বিজয়, দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।

আর দাজ্জালের সাথে যে মহাযুদ্ধ হবে তার নেতৃত্ব দিবেন ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ)। দাজ্জাল বিষয়ে হযরত হুজায়ফা (রাঃ) এর বর্ণিত এর সুবিস্তৃত হাদিসে হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের ঘটনাটি নিম্নরূপ।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের পিছনে থাকবে, যাদের গাঁয়ে তারজানি চাদর জড়ানো থাকবে (তারজানি চাদরও তায়লাসানের মতো সবুজ চাদরকে বলা হয়)। অনন্তর জুমার দিন ফজর নামাজের সময় যখন নামাজের ইকামাত হয়ে যাবে, তখন যেইমাত্র মাহদি মুসল্লিদের পানে তাকাবেন, অমনি তিনি দেখতে পাবেন, ঈসা ইবনে মারিয়ম আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। তার পরিধানে দুটি কাপড় থাকবে। মাথার চুলগুলো এমন চমকদার হবে যে, মনে হবে তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে।”

একথা শুনে আবু হুরায়রা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি তার কাছে যাই, তা হলে আমি তার সঙ্গে মু’আনাকা করব কি? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

“শোনো আবু হুরায়রা, তার এই আগমন প্রথমবারের মতো হবে না। তার সঙ্গে তুমি এমন প্রভাবদীপ্ত অবস্থায় মিলিত হবে, যেমনটি মৃত্যুর ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়। তিনি মানুষকে জান্নাতের মর্যাদা ও স্তরের সুসংবাদ প্রদান করবেন। এবার আমিরুল মুমিনীন তাকে বলবে, আপনি সামনে এগিয়ে আসুন এবং লোকদেরকে নামাজ পড়ান। উত্তরে ঈসা

বলবে, নামাজের ইকামত আপনার জন্য হেয়েছে। কাজেই ইমামতও আপনিই করুন। এভাবে ঈসা ইবনে মারিয়াম তার পেছনে নামাজ আদায় করবে।” (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১১০)

হযরত মুজাম্মা’ ইবনে জারিয়া আনসারি (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, “ঈসা ইবনে মারিয়াম দাজ্জালকে ‘লুদ’ এর ফটকে হত্যা করবে।” (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪২০; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২২৪৪)

‘লুদ’ বর্তমানে ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত। এটি তেলআবিব থেকে দক্ষিন- পূর্বে ১৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট একটি শহর। ১৯৯৯ সালের জরিপ অনুযায়ী এই শহরের জনসংখ্যা ৬১ হাজার ১ শত। ইসরাইল এই শহরে সর্বাধুনিক নিরাপত্তা সমৃদ্ধ বিমানবন্দর স্থাপন করেছে। হতে পারে, দাজ্জাল এখান থেকে বিমানযোগে পালানোর চেষ্টা করবে এবং এই বিমানবন্দরেই তাকে হত্যা করা হবে। মহান আল্লাহ তার শত্রু ও ইহুদীদের খোদা দাজ্জালকে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম(আঃ) এর হাতে হত্যা করাবেন, যাতে সমগ্র বিশ্ব বুঝতে পারে যে, মানবতার বিষফোঁড়াগুলোকে নির্মূল করতে হলে সেগুলোকে কেটে দেহ থেকে আলাদা করা জরুরী আর এই কাজটি জিহাদেরই মাধ্যমে হয়ে থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। মুসলমানরা ইহুদীদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা পাথর ও গাছের আড়ালে লুকাবে। তখন পাথর ও গাছ বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই যে আমার পেছনে এক ইহুদি লুকিয়ে আছে; তুমি এসে ওকে হত্যা করো। তবে ‘গারকাদ’ বলবে না। কেননা, সেটি ইহুদীদের গাছ।” (সুনানে মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৩৯)

গারকাদ গাছ

ইহুদীদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ জড় পদার্থগুলোকেও বাকশক্তি দান করবেন। তারাও ইহুদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। ইসরাইল যখন গোলান পর্বতমালায় দখল প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন থেকেই তারা ওখানে 'গারকাদ' বৃক্ষ লাগাতে শুরু করেছে। এছাড়াও তারা স্থানে স্থানে এই গাছটি রোপণ করছে। সম্ভবত এই গাছের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে।

দাজ্জাল ও পানি নিয়ে যুদ্ধ

সম্ভবত এখনও মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে না যে, দাজ্জাল পানি নিয়ে যুদ্ধ করবে কেন। পানি তো সব জায়গায় পাওয়া যায়। বিষয়টি বুঝতে হলে বর্তমান পৃথিবীতে পানির বাস্তবতা বুঝতে হবে। পৃথিবীতে সুপেয় পানির দুটি বড় ভাণ্ডার আছে। একটি হল তুষারময় পর্বত। এই ভাণ্ডারের পানির পরিমাণ ২৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোলিটার। দ্বিতীয়টি পাতাল। এই ভাণ্ডারটির পানির পরিমাণ ৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোলিটার।

এভাবে পৃথিবীতে বিদ্যমান পানযোগ্য পানির বড় পরিমাণটি হল বরফ, যা গলে পৃথিবীর বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ভূগর্ভস্থ পানি তার তুলনায় কম। বরফের এই মজুদ এন্টার্টিকা ও গ্রিনল্যান্ডে বেশি। আর এই দুই স্থানের উপর কোন মুসলিম রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই। বাকি থাকল ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ। এক্ষেত্রেও দুধরনের অঞ্চল থাকে। একটি সমতল অঞ্চল আরেকটি পার্বত্য। সমতল এলাকায় শহরাঞ্চলের পানির উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন কিছু নয়। কেননা, শহরাঞ্চলের পানির সমুদয় স্টক কোনো না কোনো জলাধার বা সরকারী পাম্প থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে আগত পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সেজন্য শহুরে মানুষ পানির জন্য পুরোপুরিভাবে সেখানকার প্রশাসনের দায়ভার ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

দাজ্জালের ফেতনা গ্রামের তুলনায় শহর এলাকায় বেশি কঠোর হবে এবং শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ নাগরিক উক্ত ফেতনার শিকার হয়ে যাবে। তবে পল্লী অঞ্চলের পানির উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্যও দাজ্জালি শক্তিগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে পানি নিয়ে যুদ্ধ হবে এমন গুজব আপনি শুনে থাকবেন। জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন ও সিরিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের, ইরাকের সঙ্গে তুরস্কের, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পানি নিয়ে বিরোধ- বিবাদ জীবন-মৃত্যুর সমান মর্যাদা রাখে।

দাজ্জালি শক্তিগুলো যদি মুসলিম বিশ্বের উপর প্রবাহমান নদী সাগরগুলোর উপর ড্যাম তৈরি করে এবং সেই ড্যামগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তা হলে তারা নদীগুলোর প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে এই জগতটিকে মরুভূমিতে পরিণত করে দিতে পারবে। নদী যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ভূগর্ভস্থ পানি অনেক নিচে চলে যাবে। তারপর এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষের কাছে পানযোগ্য কোন পানি থাকবে না। ফলে মানুষ ফোঁটা ফোঁটা পানির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। এখন আমরা সিরিয়া, জর্ডান ও ফিলিস্তিন এর পানির অবস্থা, ইরাকের, মিসরের এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পানি নিয়ে আলোচনা করছি।

সিরিয়া, জর্ডান ও ফিলিস্তিনঃ তাবরিয়া উপসাগর বর্তমান পূর্ব ইসরাইলে জর্ডান সিমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত। এসময়ও তাতে মিষ্টি পানি প্রবাহিত হচ্ছে। বর্তমানে তার দৈর্ঘ্য উত্তর থেকে দক্ষিনে ২৩ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্য বেশির ভাগ উত্তর

দিকে, যার পরিমাণ ১৩ কিলোমিটার। তার সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫৭ ফুট। মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ ১৫৬ কিলোমিটার। বর্তমানে তাতে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

বর্তমানে তাবরিয়া উপসাগর ইসরাইলের মিষ্টি পানির সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আর এই সাগরের পানির প্রধান মাধ্যম হল জর্ডান নদী, যেটি গোলান পর্বতমালার ধারা জাবাল আশ শায়খ থেকে এসেছে। ইসরাইল এখন যে কাজটি করেছে, তা হল তারা আগে ভাগেই তাবরিয়া উপসাগরের গতি ঘুরিয়ে ইসরাইলের দিকে নিয়ে গেছে। এর দ্বারা তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করছে। অবশিষ্ট পানিগুলো তারা মরুভূমিতে নিয়ে ফেলছে, যাতে মুসলমানদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত করা যায়। এর ফলে জর্ডানের ভূমি বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর ফলে তাবরিয়া উপসাগরও শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল সিরিয়া থেকে গোলানের পর্বতমালাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। জাবাল আশ শায়খ গোলানের পাহাড়ি ধারার সবচেয়ে উঁচু চূড়া, যেখান থেকে একদিকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং অপরদিকে দামেস্ক একেবারে তার নিচে পরিদৃশ্য হয়। তার উচ্চতা ৯২৩২ ফুট। বর্তমানে জাবাল আশ শায়খের উপর লেবানন, সিরিয়া ও ইসরাইলের কব্জা প্রতিষ্ঠিত। কিছু এলাকা জাতিসংঘের অসামরিক অঞ্চল। পানির দিক থেকে জাবাল আশ শায়খ মুক্ত অঞ্চল। এভাবে ভৌগলিক দিক থেকে এবং পানির বিবেচনায়ও এই পাহাড়ি ধারা উক্ত অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া সেই হাদিসগুলোকেও সামনে রাখতে হবে, যেগুলোতে তাবরিয়া উপসাগর, বাইতুল মুকাদ্দাস ও আফীক ঘাঁটির উল্লেখ রয়েছে। সর্বোপরি একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা যে মহাযুদ্ধের ধারণা লালন করে যে, মহাযুদ্ধ মেগড এর মাঠে অনুষ্ঠিত হবে, এই মাঠের অবস্থানও তাবরিয়া উপসাগরের কাছাকাছি পশ্চিমে। আফীক এর যে ঘাঁটিতে দাজ্জাল মুসলমানদের যে অবরোধটি করবে, তার অবস্থানও তাবরিয়া উপসাগরের দক্ষিণে।

ইরাকঃ ইরাকে বড় দুটি নদী প্রবাহমান। দজলা ও ফোরাত। উভয়টি এসেছে তুরস্ক থেকে। তুরস্ক ফোরাত নদীর উপর 'আতাতুর্ক ড্যাম' তৈরি করেছে, যেটি পৃথিবীর বড় ড্যামগুলোর একটি, যার পানি ধারনের স্থান ৮১৬ বর্গ কিলোমিটার। এই ভাণ্ডারটি ভরতে হলে ফোরাত নদীকে বর্ষা মৌসুমে এক মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাতে ঢালতে হবে। তার অর্থ হল, তুরস্ক তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ফোরাত নদীর পানি এক মাস পর্যন্ত ইরাক যেতে দিবে না। আর ইসলাম প্রশ্নে তুরস্কের আগের সরকারগুলোর অবস্থান সবারই জানা। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম বর্তমান এরগোদান সরকার। আর তাকে সরানোর সব ধরনের চেষ্টা বর্তমানে অব্যাহত।

হযরত আবু জায়িরার এক বর্ণনায় ফোরাত নদীর তীরে দাজ্জালের যুদ্ধের কথা এসেছে। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট দাজ্জালের আলোচনা উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, "তার আবির্ভাবের সময় মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল তার অনুগামী হয়ে যাবে। একদল অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে পরিজনের সাথে ঘরে বসে থাকবে। একদল এই ফোরাতের তীরে এসে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাজ্জাল তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর তারা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি তারা শামের (সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, প্যালেস্টাইন ও দখলকৃত প্যালেস্টাইন নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল) পশ্চিমাঞ্চলে লড়াই করবে। তারা একটি সেনা ইউনিট প্রেরণ করবে, যাদের মাঝে চিত্রা বা ডোরা বর্ণের ঘোড়া থাকবে। এরা ওখানে যুদ্ধ করবে। ফল এই দাঁড়াবে যে, এদের একজনও ফিরে আসবে না।" (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৪১)

মিশরঃ মিশরের সবচেয়ে বড় নদীটি হল নীলনদ। কিন্তু এটিরও উৎপত্তি আফ্রিকার উগান্ডা সেন্ট্রালের ভিক্টোরিয়া ঝিল। নীলনদের পানির সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল রুয়ান্ডা নদী। ২০১১ সালে ইথিউপিয়া সরকার ৪.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যায়ে

"গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেজিস্টেন্স ড্যাম" নামে ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহমান নীল নদের উপর ড্যাম নির্মাণ শুরু করে, যার নির্মাণ কাজ শেষ হবার কথা ২০১৭ সালে।

শুরু থেকেই মিসরের সরকার অতি নির্ভরশীল নীল নদের উপর এই ড্যাম নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছে। সর্বশেষ ৩রা জুন ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট মুরসি প্রয়োজনে এই ড্যাম ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ করার ঘোষণা দেন এবং এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্ষমতাচ্যুত হন।

এখন আমরা মহাযুদ্ধের পূর্বে ক্ষয়ক্ষতি বা ধ্বংসের ব্যাপারে কিছু হাদিসকে খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করব। শহর-নগরীর ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি যে সব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে 'খারাবুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি পুরোপুরি হোক বা আংশিক সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা ধবংসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

হযরত মাছজুর ইবনে গায়লান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "সবার আগে ধ্বংস হওয়া ভূখণ্ড হল বসরা (বর্তমান ইরাকে) ও মিশর"। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কারণে তাদের ধ্বংস নেমে আসবে; ওখানে তো অনেক বড় সম্মানিত ও বিত্তবান ব্যক্তিরা আছেন?' উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রাঃ) বললেন, "রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যাধিক ক্ষুধা। আর মিসরের সমস্যা হল নীলনদ শুকিয়ে যাবে আর এটিই মিসরের ধবংসের কারণ হবে"। (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯০৭)

যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখলের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেখানকার রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যাধিক ক্ষুধা সম্পর্কে প্রায় সব চৌকস ঈমানদারগণই ওয়াকিবহাল। আর জুলাই ২০১৩ তে মুরসির ক্ষমতাচ্যুতির পরে মিসরের রক্তপাত ও গণহত্যা সম্পর্কেও প্রায় সব চৌকস ঈমানদারগণই ওয়াকিবহাল। এখন অপেক্ষা নীলনদের করুন দশার।

হযরত ওহব ইবনে মুনব্বিহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "মিশর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জাজিরাতুল আরব (বর্তমান সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও ইয়েমেন) নিরাপদ থাকবে। কুফা (বর্তমান ইরাকে) ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে না। মহাযুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গেলে বনু হাশিমের এক ব্যক্তির হাতে কুস্তুন্তুনিয়া (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয় হবে।" (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৮৫)

এখানেও মহাযুদ্ধের পূর্বে সর্বপ্রথম মিশর ও ইরাকের ধ্বংস বা ক্ষতির কথা বলা হয়েছে এবং এই ভূখণ্ডগুলোর (ইরাক ও মিশর) ধ্বংস বা ক্ষতির আগ পর্যন্ত জাজিরাতুল আরব (বর্তমান সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও ইয়েমেন) এর নিরাপদে থাকার কথা বলা হয়েছে। আর এই জাজিরাতুল আরবেই মুসলিম বিশ্বের দুই প্রাণ প্রিয় নগরী মক্কা ও মদিনা অবস্থিত।

হযরত মু' আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বাইতুল মাকদিসের আবাদ হওয়া মদিনার ক্ষতির কারণ হবে। মদিনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কুস্তুন্তুনিয়ার (ইস্তাম্বুলের) বিজয়ের কারণ হবে। কুস্তুন্তুনিয়ার বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসের বর্ণনাকারীর (অর্থাৎ - স্বয়ং তাঁর) উরুতে কিংবা কাঁধের উপর চাপড় মেরে বললেন, "তোমার এই মুহূর্তে এখানে উপবিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই বিবরণও তেমনই বাস্তব।" (সুনানে আবী দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১০; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৪৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

‘বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদ হওয়া’ দ্বারা উদ্দেশ্য ওখানে ইহুদীদের শক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া (ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই ঘটনাটি ঘটে গেছে)। এখন ইহুদীদের নাপাক দৃষ্টি পবিত্র মদিনার উপর নিবদ্ধ। প্রকৃত ঈমানদারগণ ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেছে। এভাবে তখন থেকে শুরু হওয়া কুফর ও ইসলামের লড়াই এখন দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানঃ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বেশির ভাগ নদী এসেছে ভারত থেকে। ভারত সেগুলোর উপর ড্যাম তৈরি করছে। ভারতে নির্মিত ফারাক্কা ড্যাম এর কারণে বাংলাদেশের উপর প্রভাব সম্পর্কে আর নতুন করে লিখার কিছু নেই। আর বাংলাদেশের সাথে তিস্তার পানি চুক্তি নিয়ে চলমান নাটক সম্পর্কেও সবাই ওয়াকিবহাল।

চন্নাব নদীর উপর বাগলিহার ড্যাম নির্মাণ এবং নিলাম নদীর উপর কাসনগঙ্গা ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানের পানির গতিরোধ করে ভূখণ্ডটির পানির উপর নিয়ন্ত্রনের প্রয়াস সম্পন্ন করেছে।

২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ‘আমাদের সময়’ নামে এক দৈনিকে “পানি নিয়ে সংঘাতে জড়াবে ভারত-পাকিস্তান- বাংলাদেশ” নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে প্রতিবেদনটি নিন্মরূপঃ

“সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ কিংবা ভিন্ন কোন সমস্যা নয়, পানির সংকটই দক্ষিন এশিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যায় পরিণত হতে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের বাংলাদেশ ও পাকিস্তান প্রায় সমানভাবেই পানির সংকটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে পানির অধিকার থেকে একইভাবে বঞ্চিত করে আসছে ভারত।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী। ২০২৫ সালের মধ্যেই পাকিস্তান পানির সংকটে পড়বে। এছাড়া ২০৫০ সালের মধ্যে দেশটি পানির অভাবগ্রস্থ দেশে পরিণত হবে। একইভাবে, বাংলাদেশেও ভূ- নিম্নস্থ পানির মজুদ কমছে। ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন সুষম না হওয়া, বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অনেক আগেই। ফলে, বাংলাদেশও পানির তীব্র সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পানির সহজলভ্যতা প্রায় ৩০ ভাগ কমে যাবে। আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি অবৈধভাবে দখলে রাখা ভারতেও পানির সংকট সৃষ্টি হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটিতে বর্তমান সময়ের তুলনায় পানির সহজলভ্যতা ২৮ ভাগ কমে যাবে। একারণে, পানির অধিকার নিয়ে বাংলাদেশ- ভারত ও ভারত- পাকিস্তান সংকট আরও ঘনীভূত হবে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের পানির অধিকার পদদলিত করে ভারত আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি নিয়ন্ত্রণে একাধিপত্য বজায় রাখছে। পাকিস্তানের সাথে অভিন্ন নদীগুলো থেকে অধিক পরিমাণ পানি ব্যবহার ছাড়াও পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণেও চালকের ভূমিকা পালন করছে ভারত। একই দৃশ্য বিদ্যমান বাংলাদেশের সাথে ভারতের অভিন্ন নদীগুলোর প্রবাহের ক্ষেত্রেও। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০ সালে স্বাক্ষর হওয়া চুক্তির মাধ্যমে ভারত বিয়াস, রাভী ও সুলেজ নদীর ওপর কর্তৃত্ব পায়। অপরদিকে পাকিস্তান সিন্ধু, চেনাব ও ঝেলুম নদীর কর্তৃত্ব পায়। কিন্তু সবগুলো নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতে হওয়ায় তারা পানি প্রবাহের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রন করে। একারণে, পাকিস্তান সব সময়ই পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাকিস্তান বারবার আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কূটনীতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করলেও তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

একইভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫৪ টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়েও রয়েছে সমস্যা। পাকিস্তানের মতোই বাংলাদেশের নদীগুলোতেও পানি প্রবাহে ভারতের অবৈধ নিয়ন্ত্রনের কারণে পানির সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অনেকগুলো অভিন্ন নদী মৃত বা অর্ধ মৃত অবস্থায় আছে।

পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় দেশের অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উভয় দেশেরই কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে প্রতি নিয়ত। ফলে, সামাজিক স্থিতিশীলতা চরম হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। একারনেই, আশংকা করা হচ্ছে, পানির সংকট ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক লড়াই ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণে পরিণত হবে।"

আর দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মুজাহিদদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

হযরত নাহীক ইবনে সারীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা উর্দুন (জর্ডান) নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে। " (আল ইসাবা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৭৬)

এখানে মুশরিকদের দ্বারা উদ্দেশ্য উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী জাতি। তার মানে এটি সেই যুদ্ধ - "গাজওয়াতুল হিন্দ", যেখানে মুজাহিদরা এই উপমহাদেশে আক্রমণ চালাবে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন, ক্ষমা করে দেবেন, বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা জেরুজালেমে ফিরে যাবে এবং সেখানে ঈসা (আঃ) সাক্ষাত পাবে এবং ঈসা (আঃ) নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। (সুনানে নাসায়ী- খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২; আল ফিতান- খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯ ও ৪১০)

ইমাম মেহেদী ও ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে যুদ্ধগুলো কি শুধু তরবারি দ্বারাই লড়া হবে?

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহাযুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাঁবু (ফিল্ড হেডকোয়ার্টার) হবে শামের সর্বোন্নত নগরী দামেস্কের সন্নিকটস্থ আলগুতা নামক স্থানে।" (সুনানে আবি দাউদ- খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১১; মুসতাদরাকে হাকেম- খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৩২; আল মুগনী- খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৬৯)

আলগুতা সিরিয়ায় রাজধানী দামেস্ক থেকে পূর্ব দিকে প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল। এখানকার মওসুম সাধারণ উষ্ণ থাকে। তাপমাত্রা জুলাইয়ে সর্বনিম্ন ১৬.৫ এবং সর্বোচ্চ ৪০.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকে। জানুয়ারীতে থাকে সর্বনিম্ন ৯.৩ ডিগ্রী আর সর্বোচ্চ ১৬.৫ ডিগ্রী।

মহাযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দামেস্কের সন্নিকটস্থ আলগুতা নামক স্থানে ইমাম মাহদী (আঃ) এর হাতে থাকবে।

যেহেতু এখানে মহাযুদ্ধের বিশদ আলোচনা এই লিখার উদ্দেশ্য নয়, তাই আমরা সরাসরি মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে চলে যাব যেখানে মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার কিছুটা দৃশ্যপট বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, " 'এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যখন উত্তরাধিকারও বন্টিত হবে না, গনিমতের জন্য আনন্দও করা হবে না।' এরপর তিনি সিরিয়ায় দিকে

আঙ্গুল তুলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। বললেন, 'সিরিয়ার ইসলামপন্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ইসলামপন্থীরাও তাদের মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যাবে।' ”

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রোমানদের (খ্রিস্টানদের) কথা বলতে চাচ্ছেন? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, সেই যুদ্ধটি হবে ঘোরতর। মুসলমানরা জীবনের বাজি লাগাবে। তারা প্রত্যয় নিবে, বিজয় অর্জন না করে ফিরব না। উভয়পক্ষ লড়াই করবে। এমনকি যখন রাত উভয়ের মাঝে আড়াল তৈরি করবে, তখন উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরে ফিরে যাবে। কোন পক্ষই জয়ী হবে না। এভাবে একদল আত্মঘাতী জানবাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আরেকদল মুসলমান মৃত্যুর শপথ নিবে যে, হয় বিজয় অর্জন করব, নয়তো জীবন দিয়ে দিব। উভয়পক্ষ যুদ্ধ করবে। রাত তাদের মাঝে আড়াল তৈরি করলে চূড়ান্ত কোন ফলাফল ছাড়াই উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরে ফিরে যাবে। এভাবে মুজাহিদদের এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর আরেকদল মুসলমান শপথ নিবে। হয় জয় ছিনিয়ে আনব, নতুবা জীবন দিয়ে দিব। তারা যুদ্ধ করবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। রাত নেমে এলে উভয়পক্ষই উভয়পক্ষই জয় না নিয়ে শিবিরে ফিরে যাবে। এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

চতুর্থ দিন অবশিষ্ট মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাবে। এবার আল্লাহ শত্রুপক্ষের জন্য পরাজয় অবধারিত করবেন। মুসলমানরা ঘোরতর যুদ্ধ করবে - এমন যুদ্ধ, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, মৃতদের পাশ দিয়ে পাখিরা উড়বার চেষ্টা করবে; কিন্তু মরদেহগুলো এত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে কিংবা লাশগুলো এত দুর্গন্ধ হয়ে যাবে যে, পাখিগুলো মরে মরে পড়ে যাবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের পরিজন তাদের গণনা করবে। কিন্তু শতকরা একজন ব্যতীত কাউকে জীবিত পাবে না। এমতাবস্থায় গনিমত বণ্টনে কোন আনন্দ থাকবে কি? এমতাবস্থায় উত্তরাধিকার বণ্টনের কোন সার্থকতা থাকবে কি?

পরিস্থিতি যখন এই দাঁড়াবে, ঠিক তখন মানুষ আরও একটি যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে, যা হবে এটির চেয়েও ভয়াবহ। কে একজন চিৎকার করে করে সংবাদ ছড়িয়ে দেবে যে, দাজ্জাল এসে পড়েছে এবং তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে তোমাদের পরিবার পরিজনকে ফেতনায় নিপাতিত করার চেষ্টা করছে। শুনে মুসলমানরা হাতের জিনিসপত্র সব দিয়ে ছুটে যাবে। দাজ্জাল আগমনের সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তারা আগে দশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এই দশজন ব্যক্তির নাম, তাদের পিতার নাম, তাদের ঘোড়াগুলোর কোনটির কি রং সব জানি। সে যুগে ভূপৃষ্ঠে যত অশ্বারোহী সৈনিক থাকবে, তারা হবে শ্রেষ্ঠ সৈনিক।” (সহিহ মুসলিম- খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২২৩; মুসতাদরাকে হাকেম- খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫২৩; মুসনাদে আবী ইয়া'লা- খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৫৯)

এই হাদিসে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুধু দিনে লড়া হবে। রাতে কোন যুদ্ধ হবে না। তার অর্থ কি এই যে, এই সব যুদ্ধ পুরানো রীতিতে শুধু তীর আর তরবারি দ্বারা লড়া হবে? রাতে যুদ্ধ না হওয়ার কারণ এছাড়া আর কি হতে পারে?

মানুষ মনে করে, হযরত মাহদির আমলে আধুনিক প্রযুক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ তীর আর তরবারি দ্বারা লড়া হবে। সম্ভবত এই ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, হাদিসে ব্যবহৃত 'সাইফুন' শব্দ থেকে। 'সাইফুন' শব্দের অর্থ তরবারি। কিন্তু শুধু একে দলিল বানিয়ে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, হযরত মাহদির যুগে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ হবে। কেননা, 'সাইফুন' শব্দটি শুধু 'অস্ত্র' অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, পবিত্র কুরআনে 'ত্বইরন' শব্দের অর্থ 'পাখি'। আবার বর্তমান যুগে আরবিতে 'ত্বইরন' শব্দটি 'উড়োজাহাজ' এর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সেই যুগে যুদ্ধ তীর তরবারি দ্বারা সংঘটিত না হয়ে আধুনিক মারনাস্ত্র দ্বারা হওয়ার পক্ষে অনেক আভাস- ইঙ্গিতও হাদিসে রয়েছে। যেমন-

১। কয়েকটি হাদিসে বলা হয়েছে, হযরত মাহদির যুগের যুদ্ধগুলোতে, যেমন ফোরাতের তীরের যুদ্ধের বর্ণনায় এবং উপরের যুদ্ধের বর্ণনায় বলা হয়েছে, প্রানহানির সংখ্যা এমন হবে যে প্রতি ১০০ জনে ৯৯ জন ব্যক্তি মারা যাবে। যা শুধুমাত্র আধুনিক আনবিক অস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারেই সম্ভব।

২। যে হাদিসে দাজ্জালের বাহনের কথা বলা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, দাজ্জালের গাধা হবে খুব দ্রুতগামী, কান হবে অনেক লম্বা। এই বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, হাদিসে গাধা দ্বারা কোন প্রাণীকে বোঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা বাহনকে বোঝানো হয়েছে, যা তীব্র গতিসম্পন্ন এবং বাহনের দুই পাশে উড়োজাহাজের ডানার ন্যায় লম্বা কিছু হতে পারে। এবং আমরা জানি, বাহনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে প্রযুক্তির উপর ভর করেই।

৩। হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণিত বিস্তারিত হাদিসে আছে, আ'মাক যুদ্ধে আল্লাহ কাফেরদের উপর উপর ফোরাতের কূল থেকে খোরাসানি ধনুকের সাহায্যে তীর বর্ষণ করবে। অথচ আ'মাক (সিরিয়ায় আলেপ্পোতে তুরস্কের সীমানার কাছাকাছি গ্রাম) থেকে ফোরাতের নিকটতম তীরের দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। সাধারণ কোন তীর ধনুকের দ্বারা ৭৫ কিলোমিটার পার হওয়া সম্ভব নয়। এখানে ধনুকের উদ্দেশ্য তোপ বা ইংরেজিতে "ল্যান্ড টু ল্যান্ড মিসাইল" হতে পারে।

৪। আরেক জায়গায় হাদিসে, যুদ্ধকালীন সময়ে জাজিরাতুল আরবের অন্যতম স্থান ইয়েমেনের ধবংসের কারণ বলেছেন, ফড়িং এর আক্রমণ। আমরা জানি ফড়িং অত্যন্ত দ্রুত উড়তে সক্ষম। হয়তো এর দ্বারা তিনি যুদ্ধবিমানকে বোঝাতে চেয়েছেন।

এছাড়াও আরও অনেক ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো দ্বারা প্রতিয়মান হচ্ছে, অন্তত দাজ্জালের ধ্বংসযজ্ঞ বিস্তৃত না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক যুদ্ধকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বাকি আল্লাহ ভালো জানে।

সার কথা হল, যুদ্ধ তরবারি দ্বারাই হবে এই মর্মে নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করা এবং এই মর্মে হাদিস বর্ণনা করা ঠিক নয়। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তীর তরবারি দ্বারাই যুদ্ধ হতো। এমতাবস্থায় তিনি যদি এমন কোন সরঞ্জামের কথা উল্লেখ করতেন, যা সে সময় বোঝা সম্ভব ছিল না, তাহলে মানুষের মস্তিস্ক প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে সরে যেত এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেটি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ সেটি যথাযথভাবে বুঝতে ব্যর্থ হতো।

আবার এমনও হতে পারে, মুজাহিদরা একের পর এক আরবের তেলকূপগুলো ধ্বংস করে প্রযুক্তির ব্যবহারকে কঠিন করে তুলবে। যেখানে উভয়পক্ষ বাহন হিসাবে ঘোড়া ব্যবহারে বাধ্য হবে। বর্তমান পশ্চিমা মিডিয়া ইউটিউবের মাধ্যমে মুজাহিদদের ক্যাম্পের ট্রেনিং এর যে সব ভিডিও প্রকাশ করেছে, অনেক জায়গাতে ঘোড়ায় চড়ার ট্রেনিং দিতে দেখা গেছে।

মূল কথা, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা ঠিক হবে না।

দাজ্জালি ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় মুমিনদের দায়িত্ব

দাজ্জালের মোকাবিলায় কৃষক সমাজ

যারা দাজ্জালের প্রভুত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, দাজ্জাল তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে। এ যুগে কৃষক সমাজ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বিষয়টিতে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটি শব্দের মর্ম বুঝে নিন।

শব্দটি হল 'পেটেন্ট', যার অর্থ 'আবিষ্কৃত দ্রব্য তৈরি বা বিক্রয়ের একক অধিকার'। এটি একটি আইন, যা মালিকের মালিকানা স্বত্বকে প্রমাণিত করে। এটি নতুন এক আন্তর্জাতিক কৃষিনীতি, যাকে কৃষক সমাজের উন্নতি ও স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে বিপ্লব নাম দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নীতি কৃষকের হাত থেকে উৎপাদিত শস্যের এক একটি দানা কেড়ে নেওয়ার গভীর এক চক্রান্ত।

ইহুদী কোম্পানিগুলো যদি কোন শস্যবীজকে পেটেন্ট করে নেয়, তা হলে তার এই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে এটির মালিক হয়ে গেছে। যেমন – তারা যদি একটা নাম দিয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের কোন বিশেষ প্রজাতির চালকে পেটেন্ট করে নেয়, তাহলে সেই মুসলিম দেশের প্রতিজন কৃষক সেই বিশেষ প্রজাতির চালের বীজ উক্ত কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে বাধ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি তারা নিজেরা বীজ উৎপাদন করে, তা হলে এই অপরাধের দায়ে তাদেরকে জরিমানা আদায় করতে ও জেলের বাতাস খেতে হবে। যেহেতু এই ধরনের বীজ কৃত্রিম উপায়ে জেনেটিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, তাই এই ধরনের বীজ একবছরই ফসল উৎপন্ন করতে সক্ষম। পরবর্তী বছর যদি পুনরায় এই চালের চাষ করতে হয়, তাহলে নতুন বীজ ক্রয় করতে হবে। সেই সঙ্গে ফসলের রোগ বালাই দমনে ওই কোম্পানির ওষুধই কাজ করবে।

এই আইনটি দেখতে খুবই সরল মনে হয়। কিন্তু বিষয়টি 'যার লাঠি তার মহিষ' ধরনের। এই আইনের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক ইহুদী কোম্পানিগুলো বিশ্ব বাজারের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার পর এবার পৃথিবীর উৎপাদিত শস্যের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আইন তৈরি করেছে, যাতে কাল যদি কেউ তাদের কথা মান্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে খাদ্যের প্রতিটি কণার জন্য মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেওয়া যায়।

পেটেন্ট বিলের মাধ্যমে এভাবে তারা ধীরে ধীরে উৎপাদিত শস্যের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করে চলছে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা সমগ্র পৃথিবীর শস্যের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে হলে ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে দেখা যায়, বর্তমানে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই 'ফার্মারস কোর্ট' এ পেটেন্ট নিয়ে কৃষকদের সাথে পেটেন্টকারী কোম্পানির কত কেস চলছে।

খাদ্য উৎপাদনকে নিজের মুঠোয় নেওয়া ছাড়াও ইহুদীদের আরও একটি ধ্বংসাত্মক মিশন হল, তারা জীবাণু অস্ত্রের মাধ্যমে যে কোন ফসল ধ্বংস করে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছে। হয়তো ইতিমধ্যে কিছু জীবাণু অস্ত্র তৈরিও করে ফেলেছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বর্ণনা করেছেন, সে সব অবশ্যই পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হবে। বাহ্যিক পরিস্থিতি এখনই তার অনুকুল হোক আর না হোক। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরিস্থিতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের অনুকুল হতে চলেছে। কাজেই এখনও সে সব ভয়াবহতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে উদাসিন থাকা বিবেক ও দ্বীনদারির পরিচয় নেই।

দাজ্জালি শক্তির মিডিয়া যুদ্ধ ও সাংবাদিকদের দায়িত্ব

যেমনটি বলা হয়েছে, দাজ্জালের ফেতনায় বাস্তবতার চেয়ে মিথ্যা ও প্রতারণা বেশি থাকবে এবং সেই মিথ্যা-প্রতারনাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উপায় হবে মিডিয়া। তাই যে সব সাংবাদিক নিজেদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত মনে করেন এবং নিজেদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখতে ইচ্ছা করেন, তারা সর্বাবস্থায় দাজ্জালি শক্তিগুলোর মিথ্যা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে নিজেদের কলম ও জবানকে ব্যবহার করুন। সারা বিশ্বের কুফরি মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরন করছে এবং নিজেদের ভুল ব্যবস্থাপনাকে শান্তি ও সুবিচারের আয়োজন হিসাবে প্রমাণিত করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলমান সাংবাদিক ভাইয়েরা কি শুধু এই অজুহাতে আপন ধর্মের উপহাস-মশকারা সহ্য করে নিতে পারে যে, আমি যদি ইসলামের পক্ষে লিখি, তাহলে আমার চাকরি চলে যাবে? এর অর্থ কি এই নয় যে, দাজ্জাল এসে বলবে, আমার কথা মেনে নাও; আমার কথা মেনে নাও; অন্যথায় তোমার রিজিক কেড়ে নেওয়া হবে?

এটি কোন সংগঠনের যুদ্ধ নয়। না কোন রাষ্ট্রের, না বিশেষ কোন গোষ্ঠীর। বরং এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত ও ইবলিসের গোলামদের মধ্যকার লড়াই। বিশেষ কোন বিভাগে নয় – এই যুদ্ধ চলছে মানবজীবনের সব কটি অঙ্গনে। তাই ইবলিসের গোলামরা সেই কাজগুলোই করছে, যেগুলো তারা জীবনভর করে আসছে। কিন্তু মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত কা'ব ইবনে আশরাফের উত্তরসূরিদেরকে আপন নবীর দ্বীন-ধর্ম নিয়ে তামাশা করতে দেখে কিভাবে নীরব থাকবে?

নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্বকে কখনো অবহেলা করেননি, বরং মিডিয়াযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে যুগের প্রচলিত প্রচার মাধ্যমকে সময় ও সুযোগ মতো পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইসলামপূর্ব যুগে কাবার দেয়ালকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কাফেররা বিভিন্ন কুৎসামূলক কথা রটনা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাসূলের কবি' খ্যাত হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রা.)কে বলতেন, 'হে হাস্সান! আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে জবাব দাও। আল্লাহ রূহুল কুদস (জিবরাইল) দ্বারা তোমাকে সাহায্য করবেন।' নির্দেশ পালনার্থে হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রা.) নিজের ইলহামী কাসীদার সাহায্যে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন যে, তাদের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তারা একথা ভুলতে পারত না।

এক বর্ণনায় আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করেছিলেন, যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে জবাব দিতেন।

একবার আরবের এক গোত্র নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাব্য ও বক্তৃতায় মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ করে বসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তিনি 'রাসূলের কবি' খ্যাত হযরত হাস্সান বিন সাবেত (রা.) এবং 'খতীবে রাসূল' খ্যাত সাম্মাস বিন কায়েস (রা.) কে

মোকাবিলার জন্য নির্বাচন করলেন। দু'জনই কবিতা আবৃত্তি ও বাকশৈলীর চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী করলেন। মুসলমান কবি ও বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করে নিল।

উমরাতুল কাযার সময় যখন রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের হালতে তাঁর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করছিলেন তখন রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সামনে চলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বীরত্বের সঙ্গে কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। ওই পংক্তিগুলোতে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও সম্মানের প্রসঙ্গ যেমন ছিল তেমনি কাফেরদের প্রতি ধমকিও ছিল। ওমর (রা.) তাঁকে বারণ করার চেষ্টা করলেন। নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ওমর! তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করতে দাও। এটা ওই লোকদের ওপর তীর ছুঁড়ে মারার চেয়েও বেশি কার্যকরী।'

দুশমনের নাকের ডগায় পৌঁছে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার এর চেয়ে সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে! কেননা হুদাইবিয়ার চুক্তিপত্রে 'অস্ত্র প্রদর্শনীর' ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু 'কবিতা আবৃত্তির' ওপর কোনো বাধা ছিল না।

প্রচারণার প্রচলিত ও সহজলভ্য পদ্ধতি ব্যবহারের পাশাপাশি নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইহুদী প্রচার-মাধ্যম' এর প্রতিরোধের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কাব ইবনে আশরাফ ইহূদী প্রোপাগান্ডার এক শক্তিশালী ভিত ছিল। তার যেমন অঢেল সম্পদ ছিল তেমনি সে ছিল একজন কবি। নারীদের অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাকে গণ্য করা যায়। কবিতায় মুসলিম নারীদের নাম ধরে ধরে কুৎসা রটাত। রিসালাতের প্রতি কটূক্তিকারীদের আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারীও ছিল সে। বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা দান এবং মক্কার কাফেরদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্য মক্কা মুকাররমা চষে বেড়াত। কাফেরদের সমাবেশে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি কটূক্তি করে কবিতা পাঠ করে শোনাত। নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ ইবনে সালামা (রা.) ওই অভিশপ্তকে খতম করেন এবং চিরদিনের জন্য তার মুখ বন্ধ করে দেন।

ইহূদী আবু রাফে 'কুফুরী সাংবাদিকতার' (এটাকে যদি সাংবাদিকতা বলা হয়) সবচেয়ে বড় আর্থিক সহায়তাকারী ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে পানির মতো পয়সা ব্যয় করতো। অসৎ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিদের সেবায় দিরহাম-দিনারের থলি পৌঁছে দিত। সে কবিরা যেন জীবন-জীবিকার দিক থেকে সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়াযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে এর সব ব্যবস্তা সে করে দিত। দ্বীনী জযবায় উজ্জীবিত কয়েকজন নও মুসলিম তাকেও তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ সংবাদ পেলেন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং ওই ভয়াবহ শত্রুকে যারা জাহান্নামে পাঠিয়েছেন তাদের কামিয়াবীর জন্য দুআ করেছেন।

শেষোক্ত দু'টি ঘটনার ক্ষেত্রে ইসলামবিরোধী প্রোপাগাণ্ডা ছাড়াও ছিল ইসলামবিরোধী অব্যাহত ষড়যন্ত্র এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তি ভঙ্গের মতো অমার্জনীয় কিছু উপাদান ও উপলক্ষ্য। তাছাড়াও এসব ঘটনার কারণ ও হেকমত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলতে পারি, ওই যুগে প্রচলিত

মিডিয়াকে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের উপকার ও ফায়দার জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবহার করেছেন। মিডিয়া আগ্রাসন ও ইসলামবিরোধী প্রোপাগাণ্ডার বিষয়টিকে তিনি সামান্যও এড়িয়ে যাননি বা উপেক্ষা করেননি। আধুনিক প্রযুক্তি যখন থেকে প্রচার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করে এবং বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা যুক্ত হয় তখন থেকে মিডিয়ায় এক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। ঘরের কোণে কোণে পর্যন্ত দুশমনদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এতে মহিলা ও শিশুদের মানসিকতা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। মিডিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হয়। বর্তমানে প্রায় পুরো মিডিয়া জগৎটা পশ্চিমা পদলেহী এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের এজেন্টে ছেয়ে গেছে। নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধের ধারণাটাই তারা পাল্টে দিয়েছে। মিথ্যাকে সত্য এবং বাতিলকে হক বানিয়ে পেশ করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিক রেডিও-টেলিভিশনগুলো সংবাদের শুরুতে এবং সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অথবা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কুরআনের কোনো আয়াত অথবা হাদীসে নববীর তরজমা প্রচার বা প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, পুরো সংবাদ অথবা পুরো প্রোগ্রামে ইসলামের স্পিরিট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামের লেভেল লাগিয়ে দেওয়ার পর উগ্র বিনোদনের পৃষ্ঠাসহ অনেক কিছুই ইসলামের খাতায় সংযুক্ত হয়ে যায়। মিডিয়ায় ইসলাম ও মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ চলছে। সাংস্কৃতিক দুর্বৃত্তরা ভদ্রতা ও মানবিকতার চেহারা ঢেকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। মানবতাবিধ্বংসী কালচারে আজ ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক।

অতএব, হে কলম সৈনিকগণ, দাজ্জালি শক্তিগুলো মিডিয়ার ফুঁৎকারে ইসলামের প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আপনি একদিকে ইসলামের অনুসারী, অপরদিকে একজন মিডিয়াকর্মী। এক্ষেত্রে আপনি ইসলামের আমানতদার। আপনার কলমের উত্তাপ যেন ইসলাম-প্রদীপের আলোকে প্রজ্জলিত রাখে, সেক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার রব আপনার জন্য এই জগতের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত জগত তৈরি করে রেখেছেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে দাজ্জালি ষড়যন্ত্র রুখতে মুসলিম পুরুষদের দায়িত্ব

সাধারণত পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় যে, তারা নিজেরা তো ঠিকই নামাজ রোজা ইত্যাদি সঠিকরূপে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং জান্নাত অর্জনের জন্য পুণ্যের কাজে সময় লাগিয়ে থাকে। কিন্তু নিজের সন্তান, বোন এবং মেয়েদের ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা করেন না। যার ফলে, তাদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ধর্মীয় জীবনযাপনে বিস্তর অমনোযোগী দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষগণ এ অলসতায় মনযোগ না দেওয়ার ফলে পরবর্তীতে তা আস্তে আস্তে প্রশস্ত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এমন এক সময় এসে উপস্থিত হয় যে, সে তার স্ত্রী সন্তানকে একটি হারাম বস্তু থেকে নিষেধ করতে থাকলেও স্ত্রী সন্তান এটাকে যুগের ফ্যাশন বলে কোমর বেধে তা ব্যবহার করতে থাকে।

সুতরাং পুরুষদের উচিত – তাদের নিজেদের আখেরাত নিয়ে ফিকিরের পাশাপাশি পরিবার পরিজনকেও আগত সম্মুখ ঝড় থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থাপনা তৈরি করে। তাদের কাছে সময় দিয়ে তাদের দ্বীনী শিক্ষা দীক্ষায় প্রতিপালন করেন। সামনের ভয়ানক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

এটা ভেবে বসে পড়বেন না যে, আমি তো একা। আমার কথা কে শুনবে আর কে মানবে। এমনটি কখনও ভাববেন না। আপনি যখনই উম্মতের দরদ নিয়ে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে কোন পদক্ষেপ নিবেন, তখন আল্লাহ পাকও আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাকে সাহায্য করবেন। ফলশ্রুতিতে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না - যে কাজটি আপনি একা শুরু করেছিলেন, এখন তা লাখো মুসলমানের কণ্ঠ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন ময়দানে সাহস হারিয়ে ফেলা, নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং মন ভেঙ্গে দেয়া হকের রাস্তায় কখনও বাধা হতে পারে না। এটা তো এমন পথ, যার মধ্যে শুধু অটল থাকাটাই সফলতার লক্ষণ, রাস্তা তো এমনিতেই তৈরি হতে থাকে।

দাজ্জালি ষড়যন্ত্র রুখতে মুসলিম মহিলাদের দায়িত্ব

হযরত আবু উমামা বাহেলি (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“ইসলামের কড়াগুলো একটি একটি করে ভেঙ্গে যাবে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর মানুষ তার পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। তো সর্বপ্রথম যে কড়াটি ভাঙবে, সেটি হল ইসলামী শাসন। আর সর্বশেষটি হল নামাজ”।

(সু’ আবুল ইমান খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩৬; আল মু’ জামুল কাবীর খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৯৮; মাওয়ারিদুয যাম’ আন খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭)

অর্থাৎ মুসলিম জাতি অধঃপতনের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম যে বিষয়টি পরিত্যাগ করবে, সেটি হল ইসলামী শাসন। আল্লাহ পাকের ঠিক করে দেওয়া যাবতীয় হক আদায় করা, যতসব ফরজ আদায় করা এবং ইসলামের দণ্ডবিধির অনুসরণ করা। এই সবগুলি বিষয় ইসলামী খেলাফতের অধীনে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হয়। কাজেই ইসলামী শাসননীতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

মোটকথা, মুসলমানের জীবন থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি হারিয়ে যাবে বলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, সেটি হল খেলাফত।

যদি খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের (১৯২৪ সাল) এর পর থেকে এ সময় পর্যন্তকার ইতিহাস অধ্যায়ন করা হয়, তাহলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা সংস্কৃতির সংরক্ষণ আমাদের ঘরগুলোরই মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘরগুলোই মুসলিম সমাজকে এই পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। বহু মুসলিম ভূখণ্ডে এমনও ঘটেছে যে, এই সর্বশেষ দুর্গটি ছাড়া মুসলমানদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এমনকি মসজিদ মাদ্রাসাগুলো পর্যন্ত কাফেরদের দখলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুর্গগুলোতে অবস্থানরত ইসলামী বাহিনীগুলো সাহস হারায়নি এবং নিজ নিজ রণাঙ্গনে দৃঢ়পদে টিকে রয়েছে।

ইসলামের এই দুর্গগুলোতে যে বাহিনী আছে, তারা হল মুসলিম নারীদের বাহিনী, যারা ইসলামের জন্য সেই মহান কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে, যা ইসলামবিরোধীদের হাজার প্রচেষ্টার পর আজও অটুট রয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি। কাজেই এই পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের দায়িত্বও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। ঈমানদার মা ও বোনদেরকে এখন আগের তুলনায় বেশি সচেতনতা, সাহসিকতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের শত্রুরা আপনার মোকাবেলায় একনাগাড়ে ৯০ বছর যাবত পরাজয় বরণ করে আসছে। এসব পরাজয় থেকে তারা এই ফলাফলে উপনীত হয়েছে যে, মোকাবেলা করে এই বাহিনীটির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে না - আমাদেরকে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এবার তারা যে কৌশলটি অবলম্বন করেছে, তা হল মুসলমানদের ঘরগুলোতে যে ইসলামী বাহিনীটি অবস্থান নিয়ে আছে, তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে উদাসীন করে দিতে হবে। এই কৌশলটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকগুলো মনোমুগ্ধকর শ্লোগান নিয়ে দরদী বন্ধুর রূপ ধারণ করে তারা আপনার সামনে এসে হাজির হয়েছে।

কাজেই আমার মা ও বোনেরা! সময়ের নাজুকতা ও শত্রুপক্ষের ধোঁকা-প্রতারনা উপলব্ধি করে আপনাদেরকে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। আপন দায়িত্ব কর্তব্য থেকে উদাসীন হবেন না। মুসলমান পুরুষদের বাহিনী, যারা আপন দায়িত্ব থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা করছে, যারা মানসিকভাবে পরাজয়ের শিকার হয়ে আছে, হতাশার কালো মেঘ যাদের ঘিরে রেখেছে, আপনারা মহিলাদেরকে আল্লাহ এই যোগ্যতা দান করেছেন যে, আপনারা পলায়মান এই বাহিনীটিকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাতে পারেন, তাদের অবশ বাহুগুলোতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, ভীত সন্ত্রস্ত পুরুষদের মাঝে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তাদেরকে কর্তব্য পালনের উপযোগী বানিয়ে তুলতে পারেন।

মহান আল্লাহ আপনাদেরকে সত্তাগতভাবেই একটি সংগঠন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। একজন নারী মানেই একটি সংগঠন। এ কারণে দাজ্জালের ফেতনার বিরুদ্ধে আপনারা অনেক বেশি কাজ করতে পারেন।

সন্তানদেরকে খাঁটি মুসলমান বানানো এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় ইসলামী নিতি-আদর্শের প্রহরী হিসাবে গড়ে তোলা মহিলাদেরই দায়িত্ব। সন্তানদের মন মস্তিস্ককে শৈশব থেকেই এ কথাটি বসিয়ে দিতে হবে যে, তার ঈমান জগতের প্রতিটি বস্তুর চেয়ে মূল্যবান। কাজেই ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে যদি সমগ্র দুনিয়াকেও কুরবান দিতে হয়, তাহলে অকুণ্ঠচিত্তে তা করতে হবে। তবুও ঈমানের গাঁয়ে আঁচড়টিও লাগতে দেওয়া যাবে না।

হযরত ইমরান ইবনে সুলাইম কালায়ি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "একজন নারীর নিজ গৃহের মাঝে ছুটে বেড়ানো তার জন্য জুতাজোড়া অপেক্ষা উত্তম। স্থুলাকায়া নারীদের জন্য ধ্বংস অবধারিত। সুসংবাদ গরীব মহিলাদের জন্য। তোমরা তোমাদের নারীদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করাও আর তাদেরকে তাদের ঘরের মাঝে হাঁটাচলা করার প্রশিক্ষন দাও। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে তারা এই কাজটি করতে বাধ্য হতে পারে।" (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫১)

এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, মুসলিম নারীদেরকে আরাম প্রিয় না হওয়া উচিৎ। বরং তাদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করে নিজ ঘরে হাঁটা চলা করে জীবন অতিবাহিত করায় অভ্যস্ত হতে হবে, যাতে শরীরটা ক্ষীণ থাকে। কারণ, তাদের জীবনে এমন পরিস্থিতি আগমন করতে পারে যে, তখন নিজের সম্ভ্রম ও ঈমান বাঁচানোর তাগিদে তাদেরকে পাহাড়-বনে-জঙ্গলে পায়ে হেঁটে সফর করতে হবে। যেমনটি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়ায় ঘটছে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে আমল করুন এবং গোটা পরিবার ও বংশের লোকদের মাঝে যথারীতি ঈমানের অভিযান পরিচালনা করুন। দাজ্জালের মহা ফেতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে নিজেও সজাগ সচেতন থাকুন, অন্যদেরকেও সচেতন করে তুলুন।

স্মরণ করুন ইরাকের সেই অসহায় মায়েদের, ফিলিস্তিনের সেই বোনদের, যাদের হাতের মেহেদী শুকানোর আগেই তাদের সোহাগ উজাড় করে দেওয়া হয়েছে।

স্মরণ করুন, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের সে কন্যাদের, যারা জীবনের প্রতিটি পলক ও প্রতিটি মুহূর্ত বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে থাকে।

স্মরণ করুন, সিরিয়ার সেই নিস্পাপ শিশুদের, যারা খোলা আকাশের নিচে মা! মা! করে চিৎকার করছে, কিন্তু তাদের মায়েদের ইমাম মাহদীর আগমনপূর্ব আলামত বহনকারী নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের বনু কাল্ব গোত্রের জালেমরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আমাদের মা ও বোনদের ভুলে গেলে চলবে না, যে দাজ্জালের সঙ্গে মহাযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের (ভারতীয় উপমহাদেশের) মুজাহিদদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

হযরত নাহীক ইবনে সারীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা উর্দুন (জর্ডান) নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে।" (আল ইসাবা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৭৬)

এখানে মুশরিকদের দ্বারা উদ্দেশ্য উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী জাতি। তার মানে এটি হাদিস শরীফে বর্ণিত সেই যুদ্ধ - "গাজওয়াতুল হিন্দ", যেখানে মুজাহিদরা এই উপমহাদেশে আক্রমণ চালাবে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন, ক্ষমা করে দেবেন, বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা জেরুজালেমে ফিরে যাবে এবং সেখানে ঈসা (আঃ) সাক্ষাত পাবে এবং ঈসা (আঃ) নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২; আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯ ও ৪১০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন, "সমুদ্রের শহীদান (খ্রিস্টানদের সাথে মহাযুদ্ধে), আন্তাকিয়ার- আমাকের শহীদান (খ্রিস্টানদের সাথে মহাযুদ্ধে) ও দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের শহীদান হল মহান আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠতম শহীদ।" (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৯৩)

এসব যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে এক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, "উক্ত যুদ্ধে যে এক তৃতীয়াংশ লোক শহীদ হবে, তাদের এক একজন বদরি শহীদদের দশজনের সমান হবে। বদরের শহীদদের একজন সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে। পক্ষান্তরে এই ভয়াবহ যুদ্ধগুলোর একজন শহীদ সাতশো ব্যক্তির সুপারিশের অধিকার লাভ করবে।" (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৯)

তবে মনে রাখতে হবে, এটি একটি শানগত মর্যাদা। অন্যথায় মোটের উপর বদরি শহীদদের মর্যাদা ইতিহাসের সকল শহীদের মাঝে সবচেয়ে উঁচু।

আমাদের মা ও বোনদের বুঝার সুবিধার্থে এখানে হাদিস শরীফে বর্ণিত "গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্পর্কে আসা ৫ টি হাদিস- ই বর্ণনা করছি।

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর প্রথম হাদিস

আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলব। যদি নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা হয়ে যাব।" (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

(২) হযরত সা্ওবান (রাঃ) এর হাদিস

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদকৃত গোলাম হযরত সা্ওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হল তারা, যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আরেক দল তারা যারা ঈসা ইবনে মারিয়ামের সঙ্গী হবে।" (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর দ্বিতীয় হাদিস

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন) এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবন-ই-মারিয়াম কে সিরিয়ায় (শাম) পাবে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

"আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম। যখন আল্লাহ্ (সুবঃ) আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম; যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত। ও মুহাম্মাদ (সাঃ) ! সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একজন সাহাবী।"

বর্ণনাকারী বলেন যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ "খুব কঠিন, খুব কঠিন।" (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯)

(৪) হযরত কা'ব (রাঃ) এর হাদিস

এটা হযরত কা' ব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেনঃ "জেরুসালেমের (বাই'ত-উল-মুক্বাদ্দাস) একজন রাজা তার একটি সৈন্যদল হিন্দুস্তানের দিকে পাঠাবেন, যোদ্ধারা হিন্দের ভূমি ধ্বংস করে দিবে, এর অর্থ-ভান্ডার ভোগদখল করবে, তারপর রাজা এসব ধনদৌলত দিয়ে জেরুসালেম সজ্জিত করবে, দলটি হিন্দের রাজাদের জেরুসালেমের রাজার দরবারে উপস্থিত করবে, তার সৈন্যসামন্ত তার নির্দেশে পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সকল এলাকা বিজয় করবে, এবং হিন্দুস্তানে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষন না দাজ্জালের ঘটনাটি ঘটে।" (ইমাম বুখারী (রঃ) এর উস্তায নাঈম বিন হাম্মাদ (রঃ) এই হাদিসটি বর্ণনা করেন তার 'আল ফিতান' গ্রন্থে। এতে সেই উদ্ধৃতিকারীর নাম উল্লেখ নেই যিনি কা' ব (রাঃ) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

(৫) হযরত সাফওয়ান বিন উমরু (রাঃ)

তিনি বলেন কিছু লোক তাকে বলেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ “আমার উম্মাহর একদল লোক হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাদের সফলতা দান করবেন, এমনকি তারা হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় পাবে। আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়া ফিরে যাবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে (আঃ) এর সাক্ষাত লাভ করবেন।” (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১০)

এখানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণিত তৎকালীন হিন্দুস্তানের সীমারেখা বর্তমান ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নিয়ে।

বর্তমানে এই উপমহাদেশের মুর্তিপুজারী ভূখণ্ডের মুসলিম প্রধান ভূখণ্ডের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলে বুঝা যায় যে, এটি একদিন চূড়ান্ত সংঘাতময়রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার দ্বীন ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী মোতাবেক উম্মতের একটি দলকে এই দিকে অগ্রসর হতে হবে। এবং এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে ইসলামকে খেলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ ইমাম মাহদিকে প্রেরণ করবেন আর যার খেলাফতের সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ঈসা (আঃ) এর আগমন ঘটবে।

তাই, দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রেখে যাওয়া দায়িত্ব আমাদের মা বোনদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

দাজ্জালের ফিতনা ও ঈমানের হেফাজত

অন্ধকার ফিতনার ভয়ানক প্রতিচ্ছবি দিন দিন মানবতাকে গ্রাস করে চলেছে। ঈমানওয়ালাদের জন্য এটি কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত। কুফরের পক্ষ থেকে এদিক বা ওদিকের ঘোষণা প্রচার করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানকে একটি বিষয় বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে, পরীক্ষার এই হলটি অতিক্রম করা ব্যতীত জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেনঃ

"তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও আল্লাহ জেনে নেননি যে, তোমাদের কে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেছে আর কারা দৃঢ়পদ।" (সূরা আল ইমরান : ১৪২)

এটি আল্লাহ পাকের বিধান। আল্লাহর বিধান কখনও পরিবর্তন হয় না। আপনি হযরত মাহদী ও দাজ্জাল বিষয়ক হাদিসগুলো পড়েছেন। সবগুলো হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে, হযরত মাহদী ও ঈসা (আঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য যুদ্ধ। আবির্ভূত হয়েই তারা কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিবেন। এ কারণে প্রত্যেক মুসলমানকে আপন আপন ঈমানের ভাবনা ভাবা দরকার। নিজের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য অন্তরে যুদ্ধের চেতনা ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা দরকার। মুনাফিকদের জন্য একাজটি অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ পাক বলেনঃ

"তারা (মুনাফিকরা) যদি বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে অবশ্যই তারা এ কাজের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করত।" (সূরা তাওবা : ৪৬)

যেমনটি আগে বলা হয়েছে, মুসলমানদের ধোঁকা দিতে ইবলিসি শক্তিগুলো মিথ্যা মাহাদিকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করতে পারে আর সত্যিকার মাহদীকে 'সন্ত্রাসী' হিসাবে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কাজেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাহদীর যেসব আলামত বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে সামনে রেখে ঘটনার বাস্তবতা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে, যেগুলো অনুসরণ করে চললে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

১। দাজ্জালের যুগে বাস্তবতা ততটা হবে না, যতটা চলবে গুজব ও অপপ্রচার। এই প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হবে আধুনিক প্রচার মাধ্যম। যেমন - পত্রিকা, রেডিও, টিভি, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ইত্যাদি। কাজেই এই আধুনিক কমিউনিকেশন ও অন্যান্য সুবিধা থেকে নিজেকে যতসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে বরং এখন থেকেই এমন অভ্যাস গড়ে তুলুন যে, কাল যদি আপনি এসব প্রযুক্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, তা হলে এসব পরিত্যাগ করতে যেন আপনাকে কোন সমস্যায় নিপাতিত হতে না হয়। কাজেই এসব আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা যত কমানো যায়, আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ততই কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

২। দাজ্জালি মিডিয়া যারা পড়ে ও শোনে, তারা সাধারণত নিজের মাথায় চিন্তা করে না। বরং ওসব মিডিয়ার সংবাদ, ছবি ও পর্যালোচনাই তাদের মন-মস্তিস্কের উপর পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। তাই ওসব প্রচার মাধ্যম থেকে যথাসম্ভব নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতে হবে।

৩। এ যুগে দাজ্জালি শক্তিগুলো ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে এত বেশি প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে এই অপপ্রচারের জোরে সত্য চাপা পড়ে থাকে। এজন্য পশ্চিমা মিডিয়ার সূত্রে যদি আপনার কানে যদি কোন সংবাদ আসে, তা হলে পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সংবাদটি অন্য কানে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে আপনি দাজ্জালি শক্তিগুলোর অপপ্রচারের ক্রিয়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত নাও যদি হতে পারেন, অন্তত তার শক্তি তো অবশ্যই দুর্বল করে দিতে সক্ষম হবেন। পবিত্র কুরআন কাফেরদের এই প্রচেষ্টার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেঃ

"তোমরা যখন সংবাদটি শুনেছ, তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে সু ধারনা করল না কেন? আর কেন এ কথা বলল না যে, এটি তো সুস্পষ্ট এক অপবাদ?" (আন নূরঃ ১২)

অপর এক আয়াতে শোনা সংবাদ পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে মুখ থেকে বের করারও নিন্দা করা হয়েছে।

৪। যখন কোন বিষয়কে দাজ্জালি শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে সন্দিগ্ধ বানিয়ে দেওয়া হবে এবং বিষয়টি ঠিক, না ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে, তখন আধুনিক বস্তুগত উপকরণের মাধ্যমে তথ্য জানার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবেন। কেননা, পরিস্থিতিকে যারা দাজ্জালের চোখে দেখে আর যারা আল্লাহর নূরের সাহায্যে দেখে, উভয়ে সমান হতে পারে না। যেমন - পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

"আল্লাহ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার রবের আলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্তি অন্যদের মতো হতে পারে না।" (সূরা জুমারঃ ২২)

বর্তমান যুগের একাধিক ঘটনা প্রমাণিত করে দিয়েছে, যাদের তথ্য জানার একমাত্র উপায় প্রচারমাধ্যম, তারা সত্যের সন্ধান পায় না। বরং তারা যে সব সংবাদ বিশ্লেষণ পড়ে ও শোনে, তাই তাদের দৃষ্টিতে সত্যে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে তারা আল্লাহর বাহিনীর পরিবর্তে ইবলিসের বাহিনীকে শক্তি যোগাচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষিতজনদের বিশ্লেষণ এমন হয়ে থাকে যে, তাদের বিবেকের জন্য আক্ষেপ করা ব্যতীত কোন উপায় থাকে না।

৫। হৃদয়ের স্ক্রিনটিকে ওয়াশ করে নিন। বিবেকবান মুসলমান ভাই ও বোনেরা যখন পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ বুঝে ফেলবে এবং তাদের টিভি ও কম্পিউটারের স্ক্রিনের ঘটনাচিত্র মনে সংশয় তৈরি করতে শুরু করবে, তখন ডানে বাঁয়ে না দেখে নিজের বক্ষে স্থাপিত ক্ষুদ্র স্ক্রিনটিকে ওয়াশ করে নেওয়াটাই অধিকতর উত্তম হবে। তারপর দেখবেন, পরিষ্কার হওয়ার পর এই ক্ষুদ্র স্ক্রিনটি আপনাকে এমন দৃশ্যাবলী দেখাতে শুরু করবে, যা আপনি গোটা জীবন আধুনিক- থেকে- আধুনিকতর প্রযুক্তি ব্যবহার করেও দেখতে পারতেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে তিনি তোমাদেরকে 'ফুরকান' দান করবেন।" (সূরা আনফালঃ ২৯)

এই 'ফুরকান' ই সেই স্ক্রিন, যার পর্দায় সাধারণ চোখে দেখা যায় না এমন সব বিষয়ও পরিদৃশ্য হতে শুরু করে। মালায়ে আ'লা তথা খোদায়ী শক্তির সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে যায়, যেখানে জগতের ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়াদি চূড়ান্ত হয় এবং আল্লাহর তাজাল্লি নিপাতিত হয়। মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দূর দৃষ্টি দান করেন। অবশেষে বান্দা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতে শুরু করে।

৬। দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা কাহাফের প্রথম দিককার আয়াতগুলো পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আপনি এই আয়াতগুলো মর্ম বুঝে পাঠ করুন। দেখতে পাবেন, এই আয়াতগুলোতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

(ক) আল্লাহর হামদ ও ছানার পর কুরআনুল কারীম সত্য নবীর উপর নাজিল হওয়া।

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তার বান্দার উপর কিতাব নাজিল করেছেন..."

(খ) আল্লাহর নাফরমান বান্দাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সংঘটিতব্য অতিশয় কঠিন ও কষ্টদায়ক শাস্তির ভয় দেখানো।

"যাতে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে পারে"।

(গ) সকল অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যকারীদেরকে অনন্ত জীবনের সুখ ও শান্তির সুসংবাদ।

"আর তিনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ শোনাবেন, যারা ......"

(ঘ) সেই লোকদেরও লোকদেরও কঠিন পরিণতির ভয় দেখানো, যারা আল্লাহ্ পুত্রসন্তান গ্রহণ করেছেন বলে বিশ্বাস পোষণ করে।

"আর ভয় দেখাবেন তাদেরকে, যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।"

(ঙ) দুনিয়ার জাঁকজমককে ভঙ্গুর আখ্যায়িত করে দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়া অম্বলনের উৎসাহ দান।

"তার উপর যা কিছু আছে, তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করব।"

(চ) আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করে তার চেয়েও বড় ঘটনা শোনার জন্য মস্তিস্ক প্রস্তুত করা।

"তুমি কি মনে কর, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নির্দেশনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?"

(ছ) আসহাবে কাহফের দু' আঃ

"হে আমাদের রব, তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা কর।"

এই দু' আর মধ্যে সত্য সন্দিহান হয়ে পড়লে তখন আল্লাহর সমীপে দুটি বস্তু প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

একঃ হে আমাদের রব, আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন।

দুইঃ আমাদের বিষয়- আশয়ে, যেমন - বাতিলের বিরোধিতা ও সত্যের অনুসরণ এসব কাজে আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করুন।

এই আয়াতগুলো প্রতিদিন তিলওয়াত করে এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করে সে মোতাবেক আমল করুন। আয়াতগুলোকে মুখস্ত করে নিলে অনেক সুবিধা হবে।

৭। তাকওয়া অবলম্বন করুন। তাকওয়ার মূল হল হালাল জীবিকা। তাই হারাম পরিহার করে চলুন। এমনকি সংশয়পূর্ণ বস্তু থেকেও দূরে থাকুন। বর্তমান যুগে তাকওয়া অবলম্বন করা খুবই জরুরী। নিজেকে সেইসব আমলের পাবন্দ বানিয়ে রাখুন, যার ফলে আল্লাহর রহমত বান্দাকে সব সময় আচ্ছাদন করে রাখে। যেমন - সব সময় অজু সহকারে থাকা, নামাজ শেষ করার পর কিছু সময় জায়নামাজে বসে থাকা, তাহাজ্জুদ পড়া, বিশেষ করে যেসব লোক দ্বীনি কোন কাজে দায়িত্বরত আছেন, তাদের জন্য তো তাহাজ্জুদ নামাজ খুবই জরুরী আমল।

৮। আল্লাহর সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে নিয়মিত তরমজা ও তাফসীরের সঙ্গে পবিত্র কুরআন পাঠ করুন আর নিজের অন্তরকে আলোকিত রাখতে ও সত্যের কাফেলায় শামিল থাকতে সত্যাশ্রয়ী আলেমগনের সাহচর্য অবলম্বন করুন এবং সব সময় সত্যপন্থীদের পথ অনুসরণ করুন।

৯। দ্বীনের চর্চায় মসজিদগুলোর ভূমিকা সক্রিয় করুন। বিশ্ব কুফরি প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রচেষ্টায় রত আছে যে, মুসলমানদের জীবন থেকে মসজিদের ভুমিকাকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যেই তারা আলেমসমাজ ও ধার্মিক শ্রেণীর লোকদেরকে নানা পন্থায় বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর মোকাবিলায় প্রতিটি মসজিদে কুরআনের দরস চালু করুন।

১০। যেমনটি উপরে বলা হয়েছে যে, হযরত মাহদীর আমলে যা কিছু সংঘটিত হবে, পূর্ব থেকেই সেসবের আগাম প্রস্তুতি ঈমানের চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। যেমন - নিজেকে গরম ও ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত বনানো, লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করা, পাহাড়ে চলাচলের সাহস ও অভ্যাস করা, পাহাড়ি জীবনের সাথে নিজের স্বভাব চরিত্রকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, ঘোরতর যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া, নিজের মধ্যে ও পরিবার পরিজনকেও আল্লাহর পথে কুরবানি দেওয়ার লক্ষ্যে এখনই প্রস্তুত করতে থাকা ইত্যাদি।

কবির ভাষায়ঃ

"আমি যখন বলি আমি মুসলমান, তখন আমি শিউরে উঠি;

কারণ, আমি জানি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবী পূরণ করা কত কঠিন।"

মাওলানা আসেম উমর রচিত দাজ্জাল বিষয়ে অসাধারণ তিনটি বই পড়তে নিচের বইগুলোর কভারের উপর ক্লিক করুন (ডাইরেক্ট ডাউনলোড লিঙ্ক)